তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

বাংলা মঙ্গলকাব্যধারায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য অন্যতম; যে কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লুক্কায়িত আছে জীবনের আখ্যান কথা। সাহিত্য সর্বত্রই আখ্যান নির্ভর। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভূমিতে যদি আমরা দৃষ্টিগোচর করি তাহলে দেখব, তাতে রয়েছে দেব-দেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যান। এই কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দেবী চণ্ডী।

মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্যধারায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রকৃত নাম অভয়ামঙ্গল কাব্য। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মূলতঃ দুটি কাহিনি লক্ষ করা যায়। একটি কালকেতুর উপাখ্যান, আরেকটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। তাছাড়াও হর-গৌরী, শিব-পার্বতী, শিব-চণ্ডীর কাহিনিও রয়েছে। কবি মুকুন্দ তাঁর প্রচলিত সময়কে খুব সুন্দরভাবে কাব্যে তুলে ধরেছেন। কবি মুকুন্দ ব্যক্তিগত জীবনে যে, দুঃখ ভোগ করেছিলেন তার নিদর্শন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে কবির আত্মবিবরণীতে। আসলে "*মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমি অর্থাৎ বাংলা মধ্যযুগ নানা অসংগতি বিশৃঙ্খলায় চিহ্নিত। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মিশেছে সমাজের আভ্যন্তরীণ গলদ, শ্রেণীগত বৈষম্য বর্তমান, সুতরাং উৎপীড়নও; সুদ-বাট্ট-ভোগী মহাজনরা রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করেছে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, স্থায়ী সংহত জীবন বিন্যাসের অভাব ও সামাজিক অসংগতির চাপে বৃহত্তর নানাদিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের স্থিরতা নেই, সুখ অচিন্ত্যনীয়, শান্তি সুদূর পরাহত।*"[১] মানুষ নিরাপত্তার অভাবে ধুঁকছিল, তাই নিরুপায় অসহায় কবি স্বভাবতই গ্রাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন—

"সরকার হৈল কাল খিলভূমি লিখে লাল

বিনি উবগারে খায় ধূতি

পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম

পাই লভ্য খায় দিন প্রতি

ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ

ধান্য গোরু কেহ নাঞি কেনে

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দি

হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।

জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে

দুয়ার চাপিয়া দিল থানা

প্রজা হইল বিকলিত বেচে ধান্য গোরু নিত্য

টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা।

সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডিবাটি জার গাঁ

যুক্তি কইল গাম্ভারির সনে

দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সাঙ্গে রামা নন্দী ভাই

পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।”[২]

নিয়তির বেড়াজালে আবদ্ধ মধ্যযুগ যেন অনেকটাই তমসাচ্ছন্ন। তবুও অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর মতই দেবী চণ্ডীর দর্শন পাওয়া গেল। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশেই কবি মুকুন্দ ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে সেকালের আচার-আচরণের, বেশভুষার, ভোজনের, আমোদ-প্রমোদের, দাম্পত্য সম্পর্কের বাস্তবচিত্র দেখতে পাই। আসলে বাস্তবকে অস্বীকার করে শুধু কল্পনার ছোঁয়ায় সাহিত্য কোনওদিনই সৃষ্টি হতে পারে না। কবি মুকুন্দ ছিলেন সেই পরিচিত বাস্তব জগতেরই স্রষ্টা।

ষোড়শ শতাব্দীতে কবি মুকুন্দ যখন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন তখন সমাজে জমিদারদের অত্যাচারে মানুষ ঘরবাড়ি ত্যাগ করে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কবি মুকুন্দও তার ব্যতিক্রম নন, তাই মুকুন্দ তাঁর দুঃখের আখ্যান আত্মবিবরণীতে তুলে ধরেছেন। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে মুকুন্দকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল; কিন্তু জীবন যত এগিয়ে যায় জীবন-পানে আসা সমস্ত বাধা বিপদকেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। মুকুন্দও সেই বাস্তবকে মেনে নিয়েই রচনা করেছেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য।

কবির জীবনে দেখা দিল নিরন্তর অভাব-দুঃখের মেঘ কালো হয়ে জীবনকে ঘিরে ফেলেছে, এই দুঃখ কাটিয়ে ওঠার জন্যই মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে আসছে। তবে সংগ্রাম করতে হলেও শক্তির প্রয়োজন যে শক্তিরূপ হলেন দেবী চণ্ডী।

"*অনার্য কিংবা বৌদ্ধ অথবা যে-কোন উৎস থেকেই চণ্ডীর উদ্ভব হোক না কেন, মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে স্পষ্টতই পুরাণ-স্বীকৃত দেবী। পৌরাণিক চণ্ডীর নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা যে চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লিখিত বলে অনুমিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর দুর্গা সপ্তশতী শ্লোকে (৮১-৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত) হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে গুপ্তযুগের কবি কালিদাসের লেখনীতে অসুরনাশিনী ভয়ঙ্করী দেবী মাতৃরূপিণী কল্যাণময়ী জননীতে পরিণত হয়েছেন। কবিকঙ্কণ সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের এইসব সম্পন্ন ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, আর তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন নিজস্ব কিছু কল্পনা, প্রবণতা ও চরিত্র চিত্রণের পদ্ধতি। তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রতিভাশক্তি সাযুজ্যতা লাভ করেছিল বলে সংস্কৃত সাহিত্যের ঋণ বাইরের আরোপিত বিষয় না হয়ে সাঙ্গীকৃত উপাদান হয়ে উঠেছিল।*"[৩]

দেবী চণ্ডীর চরিত্রে মানবিকতার স্পষ্ট স্ফুরণ কবি মুকুন্দের স্বাতন্ত্র্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। "*শুধু কালগত ব্যবধানই নয়, দেশজ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেও কালিদাস-অঙ্কিত উচ্চবংশীয়া আদরিণী কন্যা পার্বতী, চক্রবর্তী-কবির হাতে নিম্নবিত্ত বাঙালি ঘরের সমস্যাপীড়িতা গৃহিণীতে পরিণত হয়েছেন। পৌরাণিকতার মহিমময় আবরণে ঢাকা অধৃষ্য মহাশক্তি মহামায়া এখানে যেন সহজ সম্পর্কের প্রত্যক্ষতা নিয়ে আসেন। শাক্তপদাবলীতে জগজ্জননীকে যে ঘরের মেয়ে উমাতে রূপ ধারণ করতে দেখা যায়, তার শুভ সূচনা কবিকঙ্কণই করেছিলেন বলে প্রতীতি*

জন্মায়। অস্বীকার করার উপায় নেই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পার্বতীর উপাখ্যানের প্রথমাংশে কালিদাসের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, কিন্তু বিবাহোত্তর গার্হস্থ্য অংশটি প্রথানুগত্যে পরিণত হয়নি।"[৪]

সতী, পার্বতী ও অভয়া – চণ্ডীর এই ত্রিবিধ মূর্তি পরিচয় আমরা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পাই। এই তিনটি রূপের মধ্য দিয়ে অন্তর্জীবনের সুস্পষ্ট ছবি এখানে ফুটে উঠেছে অর্থাৎ সতী-শিব, পার্বতী-শিব, চণ্ডী-শিব, এই চরিত্র যুগলের মধ্য দিয়ে ছবিটা আরও সুন্দরভাবে আমাদের কাছে ধরা দেয়। *"ত্রিভুবন ও দেবাসুর-নর সৃষ্টির পরে দক্ষের কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ, শ্বশুর-জামাতার মনান্তর, বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষের যজ্ঞোৎসবে সতীর আগমণ ও আত্মোৎসর্গ, শিব-অনুচরের হাতে দক্ষের নিগ্রহ, তপস্যা করিতে হিমালয়ে শিবের গমন এবং তাহার পর, প্রধানত কালিদাসের কুমার সম্ভবের অনুসরণে, শিবের তপস্যাভঙ্গ, পার্বতীর তপস্যা এবং শিবের সহিত পার্বতীর বিবাহ, তাহার পর শিবের ঘরজামাই রূপে শ্বশুরালয়ে বাস, গণেশের ও কার্তিকেয়ের উৎপত্তি, মাতার সহিত পার্বতীর মনান্তর, সপরিবারে শিবের কৈলাসে প্রস্থান, সেখানে দারিদ্র্যের সংসারে পার্বতীর ক্লেশ।"*[৫]

অতএব সতী, পার্বতী, চণ্ডী যে রূপই থাকুক না কেন ক্লেশ সকলরূপেই ছিল। কারণ নারীর যেন ক্লেশ, কষ্ট উপভোগ করার জন্যই জন্ম। সতী দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাদ পুরোপুরি আস্বাদন না করেই দেহত্যাগ করলেন, পার্বতীর দাম্পত্য সম্পর্কে দারিদ্র্যের হাতছানি- শুধুই অভাব।

পিতা দক্ষ সতীকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কারণ সতীর স্বামী শিবের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে—

"জাতের নাহিক স্থিতি সে জন কন্যার পতি
দেবকূলে কেবল গুঞ্জন।
সতী ঝি গুণনিধি তারে বিড়ম্বিল বিধি
পতি সে দরিদ্র দিগম্বর।
কুলে হইল দোষ মনে নাহি সন্তোষ
অপযশে কান দিগন্তর।

শ্বশুর জেমন তাত　　　　　　　　তারে না জুড়িল হাথ

সভায় করিল অপমান

নত্র লোকে অনুরাগ　　　　　　　　ঘুচয়ে যজ্ঞের ভাগ

বেদপথে নয়ে অবধান।”[৬]

তাহলে এই কথা সমাজে সহজেই অনুমেয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর সমাজে একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বংশ পরিচয় এতটা প্রাধান্য পাচ্ছিল না, সেখানে শিবের কোনো বংশ পরিচয় নেই বলে সতীর পিতা দক্ষ সতী ও শিবের বিবাহে রাজী নন; কারণ তিনি নিজে একজন উচ্চ কূলের মানুষ। তাছাড়া শিবের মত স্বামী পেয়ে সতী নিজেকে “*বিধিমোরে কৈল জন্মদুঃখী*”[৭] বলে সম্বোধন করেছেন। স্বামীকে কেন্দ্র করেই নারীর জীবনের সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছুই নির্ভর করে। তবে শিবের মত স্বামীকে পেয়ে সতী নিজেকে কেন ‘জন্মদুঃখী’ বললেন তার ব্যাখ্যা হয়তো সামাজিক রীতিতেই করা যায়। কারণ শিব শ্মশানবাসী – সংসারের গার্হস্থ্য কর্মে তার যেন কোনো মনোযোগ নেই। তবে স্বামীর অপমান স্ত্রী সতী কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারেননি, তাই পিতা দক্ষ কেন তাঁর স্বামীকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানালেন না তা নিয়ে স্বামী সোহাগিনী সতী পিতাকে বিঁধলেন; কিন্তু পিতা দক্ষ সরাসরিই তাঁর স্বামীর নিন্দায় মুখর হলেন –

“*উচিত কহিতে কথা　　　　　　　　মনে পাছে পাও ব্যথা*

জেবা ছিল কপালে লিখন

তোমার কর্মের গতি　　　　　　　　স্বামী হইল বামপথি

তারে যজ্ঞে আনি কী কারণ।

শিবের পরিধান বাঘছাল　　　　　　　　গালাত্র হাড়ের মালা

বিভূতিভূষণ জার অঙ্গে

শ্মশানে জাহার স্থান　　　　　　　　কেবা করে তার মান

প্রেত ভূত চলে তার সঙ্গে।”[৮]

স্বামী সম্বন্ধে এহেন অপবাদমূলক বাক্য শুনে সতী আর স্থির থাকতে পারলেন না—

"দেব নর নাগ শিবে করয়ে পূজন

তোমা বিনে দোষ তারে না দেয় কোনজন।

গুরুজনের নিন্দা শুনিঞা আচ্ছাদি শ্রবণে

জেই নিন্দা করে তার করিব শাসনে।

সেই স্থান ছাড়িয়া কীম্বা জাই অন্যস্থান

বাপ-প্রতিকার হেতু তেজিব পরাণ।

হৃদয় সরোজে চিন্তি শিবের চরণ

দৃঢ় করি মহাদেবী পরিল বসন।

যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা।"[৯]

এভাবে সতী দেহত্যাগ করলেন, পরবর্তী প্রজন্মে তিনি পার্বতী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবী চণ্ডীকে নানারূপে আমরা দেখি, সতী, উমা, পার্বতী, অরণ্যদেবী। উমা বাপের বাড়িতে আছেন; কিন্তু মা মেনকা কন্যাকে বাপের বাড়িতে রাখতে রাজি নন, কারণ বিবাহিত কন্যার বাপের বাড়িতে বেশি বাস করা সমাজ অনুদিত নয়, তাঁর স্বামী-শিব গৃহজামাই দরিদ্র, সংসার সামলাতে সামর্থহীন। "*পুরাণ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত পার্বতীর সাধিকা রূপটিই যেন এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবির কৃতিত্ব তার পরবর্তী অংশে বিশেষত বিবাহের পর পিতৃগৃহে থাকার সময়ে উমার যে মূর্তি লক্ষ্য করি তাতে না আছে পৌরাণিকতা, না আছে প্রাচীন সাহিত্যের অনুসরণ। এখানে পার্বতী চরিত্রের গ্রাম্যতা কবিকঙ্কণের নিজস্ব আমদানি, যার প্রভাবে উমা তাঁর দৈবী মহিমা হারিয়ে পরিণত হয়েছেন কোন্দল-পরায়ণ গ্রাম্য ঝিয়ারীতে। তাঁর আলস্য, অহঙ্কার কিংবা অভিমান কবি তাঁর পরিপার্শ্ব থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়।*"[১০] তাই লোকনিন্দার ভয়ে মা মেনকা কন্যাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন—

"হেনকাল মেনকার বাড়িল বিরস।

তোমার ঝি হইতে মোর মজিল গার‍্যাল

গরে জাও ভাঞ্জি রাখি আ পুষিব কতকাল।

প্রভাতে ভাতেরে কান্দে কার্তিক গণাই।”[১১]

এভাবে অভাবের সংসারে প্রতিনিয়তই ক্ষুধার জ্বালায় আর্তনাদ করতে হয়। আসলে কবি মুকুন্দও তাঁর জীবনে এই আর্তনাদ করেছিলেন – তাই তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। “*শিব-চণ্ডীর গার্হস্থ্য জীবন-কথায় সমকালীন বঙ্গসমাজের বিশেষ করে পারিবারিক জীবনের উত্তপ্ত ছবি আছে। বৃদ্ধ পাত্রে কন্যাদান, অবস্থাপন্ন শ্বশুরালয়ে ঘরজামাই হিসেবে অবস্থানের অসম্মান, নিজ সংসারে চলে গিয়ে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ – এই সমাজ বাস্তবতা মুকুন্দরামে যেমন তেমনি কয়েক শতাব্দী পরের জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।*”[১২] হর-গৌরীর বিবাহের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠে।

“*বৃষ আরোহণ কৈল দেব পঞ্চানন*

মধ্যে কাণ্ডার পট্ট ধরে কোনজন।

শিবে প্রদক্ষিণ গৌরী কইল সাতবার

নিছিয়া পেলিল পান কইল নমস্কার।

মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল

দেখি দেবতার সুখ বাড়িল বিশাল।

হরিষে পুলকতনু দুজনে ছামনি

হুলাহুলি দিল জত দেবতা রমণী।

ব্রহ্মা পুরোহিত কৈল বাক্যের বিধান

হিমালয় আনন্দে করেন কন্যাদান।

হরগৌরী একাসনে বসি দুইজনে

গ্রন্থচূড়া পিতামহ করিল বন্ধনে।

গন্ধপুষ্প দিয়া বহ্নি পূজিল দম্পতী

হরগৌরী সানন্দে দেখিল অরুন্ধতী।”[১৩]

কন্যাদান করে পিতা আনন্দ পাচ্ছেন, কারণ কন্যাদান বিশেষ পুণ্যের কাজ এমন কথা সমাজে প্রচলিত আছে। তাছাড়া একটা বিবাহকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত রীতিনীতি গড়ে উঠে তা এই কাব্যে লক্ষ করা যায়। আসলে সেকালে যে সমাজ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় তা যেন বহু শতাব্দী পরের সমাজ জীবনেও লক্ষণীয়। সমাজে প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছিল অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের কাহিনির মধ্য দিয়ে এই অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। হর-গৌরী, শিব-পার্বতী, শিব-সতী, শিব-চণ্ডী, গিরিরাজ-মেনকা, কালকেতু- ফুল্লরা, ধনপতি-লহনা-খুল্লনা – তাদের কথা বয়নেই এ চিত্র ফুটে উঠেছে। “*এক একটি গল্প-কাহিনিকে আশ্রয় করে অলৌকিকতার সঙ্গে উদ্দিষ্ট দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম বিশেষত্ব হয়ে দেখা দিয়েছিল। ... কবিকঙ্কণের চণ্ডী তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, তা যুগ সমাজ ও লোকভাবনার সৃষ্টি। চণ্ডীতত্ত্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে আর্য-অনার্যের মিশ্র চিন্তা, যা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল।”*[১৪]

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়েছে। দেবী চণ্ডী নানা নামে পূজিতা—

“*আদ্যাশক্তি মহামায়া　　　　পরম বিষ্ণু ছায়া*

দক্ষের দুহিতা আমি সতী।

তথা নাম দাক্ষায়নী　　　　দক্ষ-মুখ-বিনাশিনী

হেমন্তনন্দিনী হৈমবতী।।

চণ্ডা চণ্ডাবতী চণ্ডী　　　　প্রচণ্ডী দানবখণ্ডী

অপর্ণা অম্বিকা নারায়ণী।।

দুর্গা দুর্গা পরাবলী　　　　দুর্জ্জয়া দক্ষিণাকালী

মহেশ্বরী শিখরবাসিনী।।

ভবানী ভাবিনী ভীমা   ভৈরবী তারিণী উমা

ভয়ঙ্করী ভকত-বৎসলা।।

ভবপ্রিয়া ভগবতী   স্বাহা স্বধা সদাগতি

আমি শিবা সর্ব যে মঙ্গলা।।"[১৫]

তাহলে এ কথা বলা অনুমেয় যে, চণ্ডীর নাম স্মরণে মঙ্গল অনিবার্য।

ওঁরাও উপজাতিদের মধ্যে দেবী চণ্ডীর পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত। এই উপজাতিদের মধ্যে অবিবাহিত যুবকরা দেবী পূজা করে। ওঁরাও সমাজে তিনি 'চাণ্ডী' নামে অভিহিত। দেবী চাণ্ডী ব্যাধ দেবী ; তাই পশু শিকারে উদ্যমী যুবকরা জয়লাভের জন্য দেবীর অর্চনা করত।

"ছোটনাগপুরের দ্রাবিড়ভাষী ওঁরাও জাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামক এক শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি শিকারী ও যোদ্ধাদের বিজয়দাত্রী। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর ব্যাধ কালকেতুর পূজিত মঙ্গলচণ্ডীর কার্যাবলি ও মহিমার সঙ্গে এই চাণ্ডী দেবতার বহুল সাদৃশ্য রয়েছে। যথা – ১) ওঁরাওদের চাণ্ডী মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা (২) বহুরূপধারিণী (৩) শিকারীর দৃষ্টি থেকে পশু-গোপনকারিণী ইত্যাদি... ওঁরাও সমাজের উপরিবর্ণিত চাণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ-কাহিনি-বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, উভয়েই অভিন্ন।"[১৬]

তাছাড়া অন্যভাবে বলা যায়,

"চাণ্ডী স্ত্রী দেবতা, তিনি প্রসন্ন হইলে পশু-শিকারে কৃতিত্ব ও যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। অবিবাহিত ওঁরাও যুবকদিগের এই দেবতাই প্রধান দেবতা। গোলাকৃতি একখণ্ড পাথরের টুকরোর মধ্যে তাঁহার পূজা হয়। যখন ওঁরাও যুবকগণ শিকারে বাহির হয়, তখন তাহারা চাণ্ডীশিলা নিজেদের সঙ্গে রাখে.... প্রত্যেক ওঁরাও পল্লীতে, সাধারণত কোনও পর্বতের ঢালু জায়গায়, চাণ্ডী-ঢাঁড় নামক এক কিংবা একাধিক স্থান থাকে, সেখানে একটুকরো পাথরের মধ্যে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হইয়া থাকে। একটি বড় চাণ্ডী শিলার চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শিলা

থাকে, তাহাদিগকে চাণ্ডীর ছেলেপিলে বলা হয়। ... ওঁরাও দিগের বিশ্বাস চাণ্ডীশিলা বৎসরের পর বৎসর অলক্ষে বাড়িতে থাকে। ... উল্লিখিত চাণ্ডী ব্যতীত ওঁরাও দিগের সহরুল উৎসবের সময় আর এক চাণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে, তাঁহার নাম মূর্তি চাণ্ডী। কোনও বৃক্ষের নীচে অর্ধপ্রোথিত প্রস্তর খণ্ডে মূর্তি চাণ্ডী অধিষ্ঠিতা থাকেন। ... ছোট নাগপুরের মুণ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির মধ্যে মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা নামক এক দেবতা আছেন। তাঁহার কোন মূর্তি নাই। বীরহোড়গণ যে পর্ণকুটীরে বাস করে, তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানের বৃক্ষতলে এক কিংবা একাধিক প্রস্তরখণ্ড চাণ্ডীবোঙ্গা কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা হয়। গোষ্ঠিগতভাবে দল বাঁধিয়া শিকারে বাহির হইবার পূর্বে চাণ্ডীবোঙ্গার নিকট শিকারের সকল সরঞ্জাম, যথা জাল দড়ি, কুঠার, কাঠি ইত্যাদি স্তূপীকৃত করিয়া আনিয়া রাখা হয় এবং শিকারে সাফল্যের জন্য চাণ্ডীদেবী বা চাণ্ডীবোঙ্গার নিকট মোরগ বলি দেওয়া হয়।”[১৭]

তাহলে একথা অনায়াসেই বলা যায় যে, দেবী চণ্ডী স্থান ভেদে নানাভাবে নানারূপে পূজিতা। *“... বর্তমান পর্যায়ের আলোচ্য মঙ্গল দেবতাদের রূপ, ভাব, এবং ঐশ্বর্য চিন্তনে আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-লৌকিক দেব-পরিকল্পনার প্রভাব পড়েছে ইতিহাসের বিভিন্নধাপে, বিচিত্রসূত্রে। যে-সব বাংলা কাব্য-পাঁচালিতে এই দেবতাদের পরিচয় বর্তমানকালে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবকয়টিই ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সমাজের কবি-ভাবনার সৃষ্টি বলে তাতে আর্য ঐতিহ্যের ছাপ বেশি। তা সত্ত্বেও, এই সব দেবতা আজও বহুস্থলে লোক-সাধারণ এবং নারীসমাজের মধ্যেই সবিশেষ পূজিত। অপরাপর নানাসূত্র থেকেও এইসব দেবতার পরিকল্পনায় মৌলিক অনার্য উৎস-সম্ভবতার অনুমান সিদ্ধ হয়ে থাকে। মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষেত্রেও একই কথা। অতএব, ওঁরাও, মুণ্ডা, অথবা কিরাত-মোঙ্গলিও, যেখান থেকেই হোক, চণ্ডীদেবী মূলত আর্যেতর সমাজ থেকেই প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিলেন...। কালে কালে বেদ, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ, এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রাদির নানা দৈবীকল্পনার প্রভাব তাঁর ওপরে এসে পড়েছে। আর এই বিমিশ্ররূপ প্রকৃতি নিয়েই ষোড়শ শতকের চণ্ডীকাব্যে তাঁর আবির্ভাব।”*[১৮]

অতএব বলা যায়, দেবী চণ্ডী প্রথমে নিম্নশ্রেণির সমাজেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিলেন। মনসার মত দেবী চণ্ডীও নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে উচ্চসমাজে স্থান লাভ করেন। *“জগৎ*

ও জীবন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মানুষ প্রজাতির উদ্ভবের সমকালীন। বলা যায় এ জিজ্ঞাসা মানুষের সহজাত। মানব-সভ্যতার শৈশবে সীমাহীন অজ্ঞতা ও অদম্য কৌতূহল নিয়ে মানুষ জগৎ ও জীবন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসার মনোরম উত্তর সন্ধান করেছে।... পূর্ব মীমাংসকরাও জগৎকেই সত্য বলে জানতেন এবং তাঁরা ঈশ্বর বলে কোনো নিয়ন্ত্রক শক্তি মানতেন না। তবু অসহায় ভোগলিপ্সু মানুষ এ-বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারেনি, তারা মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে, সাফল্যে ও ব্যর্থতায় এক বা একাধিক তৃতীয় শক্তির প্রভাব অনুভব করে এবং সাফল্য সহায় মিত্রশক্তি এবং ব্যর্থকারী অরিশক্তি মানুষের মনোভূমে অস্তিত্ব পায় এভাবেই। ভয় থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি। ভয় অপ্রাপ্তির, ক্ষতির এবং অসুখের। অতএব ভয়-ভরসাগত দৈবশক্তির উৎসমূল অভিন্ন।"[১৯]

সুতরাং বলা যায়, ভয় থেকেই জন্ম নিয়েছে ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজা নিবেদন করা। মানুষ নিজের জীবনের সর্বকল্যাণ ও মঙ্গল করেই দেবী চণ্ডীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে সেই সময়ে। নারী দেবতার প্রাধান্য সমাজে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ "*প্রাচীন বাঙলার প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্তিরূপ এবং শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণ সুন্দর রূপ সমসাময়িক বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া দুর্গা বা দেবীও নানারূপ ও নানানামে পূজালাভ করিতেছিলেন। শিব-গৌরীর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যে যে-ধরনের পারিবারিক ও সংসারগতভাব কল্পনা বিস্তৃত তাহার আভাসও প্রাচীনকালেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে একদিকে যেমন সমসাময়িক বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও স্পর্শালুতা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালি চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারীভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ।... কোনও দেবতাই যে দেবী ছাড়া সম্পূর্ণ নহেন, নর যে নারী ছাড়া সম্পূর্ণ নহে কেবল তাহাই নয়; সে-ভাবনা তো পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবায়তন-কল্পনার মধ্যেই ছিল, কিন্তু নারীকে শক্তিস্বরূপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা, সৃষ্টি রহস্যের মূল বলিয়া কল্পনা করা – ইহার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ, সংসারগত ইন্দ্রিয়ালুতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অনস্বীকার্য এবং এই ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতের, বিশেষভাবে বাঙলায় সৃষ্টি এবং আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দান।"*[২০]

দেবী চণ্ডী শক্তিস্বরূপিনীরূপেই পূজিতা, মাতৃদেবতারূপেই বন্দিতা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর

সূচনাতে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য জগতে এক বিরাট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির মধ্য থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উদ্ভব হয়। সমাজের নিম্নস্তরে বসবাসকারী লোকদের দ্বারাই তাঁরা পূজিত হতেন। *"মুসলমান রাজগণের আমলে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের মধ্যে শৈথিল্য ঘটায় নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত বহু দেবদেবী প্রাধান্য লাভ করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শীতলা, বাশুলী, মনসা, চণ্ডী ইত্যাদি। হিন্দু দেবতামণ্ডলে স্থান দেবার জন্য তাদের অধিকাংশকে শিব জায়া উমার সহিত অভিন্ন করা হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ যুগের হিন্দুসমাজে গৃহীত এই সকল দেবদেবী বাঙলাদেশে কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণী কর্তৃক পূজিত এইসকল দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আর্যসমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিল পুরুষদেবতা, আর আর্যেতর সমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। আর্যদেবতাসমূহ যতই প্রাধান্য লাভ করতে লাগলেন, আর্যেতর এই সকল নারীদেবতাসমূহ ততই পর্বত কন্দরে, ঝোপজঙ্গলে বা গাছতলায় আশ্রয় লাভ করলেন। কিন্তু মধ্যযুগ যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এইসকল নারীদেবতা তাঁদের পর্বতকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশ লাভ করতে লাগলেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য তাঁদের পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হল।"*[২১]

মঙ্গলকাব্যসমূহের কেন্দ্রবিন্দুতে দেবদেবীরাই প্রধান ভূমিকায় অবস্থান করেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দেবী চণ্ডী। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য দেবীর ছলনায় নীলাম্বর ব্যাধরূপে পৃথিবীতে আসেন; তাঁর পত্নী ছায়াও তাঁর সঙ্গে আসেন। পৃথিবীতে তাদের কালকেতু ও ফুল্লরা নামে পরিচিতি দেওয়া হয়। কালকেতু পশুশিকার করে; আর তার স্ত্রী মাংসের পসরা সাজিয়ে বসে। তাদের সংসার জীবনে দারিদ্র্য নিত্য সহচর। কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশু পক্ষীরা নিরূপায় হয়ে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়। দেবী চণ্ডী তাদের অভয় দিলেন। দেবী কালকেতুকে ছলনা করেন এবং পরবর্তিতে স্বর্ণগোধিকা হয়ে কালকেতুর কাছে ধরা দিলেন এবং দেবী ফুল্লরার নিকটে এক নারীমূর্তি হিসেবে প্রকাশিত হন; ফুল্লরা তাঁকে দেখে সতীনভাবে স্বগৃহে

ফিরে যাবার জন্য বলে। পরবর্তিতে দেবী আত্মপ্রকাশ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন এবং একটি অঙ্গুরি দিয়ে প্রস্থান করেন। দেবীর আদেশে কালুকেতু গুজরাট নগর প্রতিস্থাপন করল। তবে ভাঁড়ুদত্তের চক্রান্তে কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে তার যুদ্ধ দেখা দিল; কালকেতু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হলো। তবে দেবীর নির্দেশে কালকেতু মুক্তি লাভ করে এবং কলিঙ্গ রাজের সহায়তায় রাজ্য ভোগ করতে লাগল; পরবর্তিতে স্বর্গে ফিরে যায়। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি মূলতঃ এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পর্বের এই কাহিনি থেকে দুটি সূত্র বের করা যায়। প্রথমত চণ্ডীর সামাজিক স্বীকৃতি, দ্বিতীয়ত নারীদেবতা চণ্ডীর মতানুসারে কালকেতু তার জীবনে অগ্রসর হয়েছে। নারীশক্তির প্রতিষ্ঠার সূচনা ধীরে ধীরে হচ্ছে কারণ, ''*সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে, অথবা উৎপাদন ও সৃষ্টিশীল কর্মের দিক থেকে বিচার করলে শিব সমস্ত সৃষ্টিধর্মী কর্ম থেকে বিরত হয়েছেন। সামাজিক পরিবেশ যে মুহূর্তে প্রচণ্ড কর্ম ও উদ্যমের দাবি জানায়, সেই মুহূর্তে এই কর্ম ও উদ্যমের উপযোগী কোন প্রেরণা দেওয়ার মত শক্তি তাঁর নেই ; কর্মের বদলে আছে ঔদাসীন্য, বিরাগ। অথচ সৃষ্টির আহ্বান ও আকুতি তখন চর্তুদিকে, তাকে ভাষা পেতেই হবে; সৃষ্টিকে ভাষা দিয়ে মানুষ ভাষা দেবে নিজেকেই। কিন্তু শিব-পুরুষ দেবতা – সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন, তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে এমন কোন শক্তির আশ্রয় করতে হয় যা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে যার চাওয়া-পাওয়ার সম্ভাবনা অপরিসীম। সৃষ্টি-অক্ষম পুরুষ দেবতার প্রতিবাদে মানুষ সহজেই সৃষ্টি সমর্থ মেয়ে দেবতাকেই স্থাপন করে ; বিশেষ করে মাতৃমূর্তিই যখন রক্ষণাবেক্ষণ এবং সৃষ্টি উভয়েই প্রতীক। শিবের স্থানে শক্তির প্রতিষ্ঠা তাই স্বাভাবিক।*''[২২]

দেবী চণ্ডীর উপর সেভাবে শক্তির আরোপ করা হয়েছে ; তা সেকালে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ সমাজে যেভাবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে মানুষের জীবনে শুধু হাহাকার দেখা দেয়। এই সমস্ত পরিস্থিতিকে জয় করতে হবে। তবে জয় এত সহজে মেলে না; জয় লাভ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। তাই মানুষ শক্তিস্বরূপিনী দেবী চণ্ডীর চরণে নিজেকে নিবেদন করে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে এই কামনায়। ঠিক এভাবেই কালকেতু নিজেকে তুলে দিয়েছিল দেবী চণ্ডীর চরণে। কালকেতু তার মনোগতভাবকে দেবী চণ্ডীর মাধ্যমে প্রকাশ করল।

"এইভাব সেকালের সাধারণ লৌকিক জীবনের ভাব, তাই অনার্যব্যাধ কালকেতুর আশ্রয় করে তা রূপ পেল। দেবী চণ্ডী অকারণ কালকেতুকে কৃপা করলেন, তেমনি অকারণে কলিঙ্গ রাজকে বিব্রত করলেন, প্রবল বন্যায় কলিঙ্গ ভাসিয়ে দিলেন। কেন না, তাঁকে তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে নতুনকে; কলিঙ্গ পুরানো জীর্ণ শৈব দেশ, তাই নানা অসম্পূর্ণতা ও কলুষে তা ভরপুর। এই অসম্পূর্ণতাকে দূর করে সৃষ্টি করতে হবে পূর্ণতাকে, কলুষ দূর করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অনাবিল সৌন্দর্যকে। দেবীর কার্য তাই 'না' এবং 'হা' – এই দুইভাগে বিভক্ত; না-এর দিক হল কলিঙ্গের ক্ষয়ের দিক, আর হ্যাঁ-এর দিক হলো কালকেতুর গুজরাটে নতুন রাজ্য স্থাপনের দিক। মানুষের সৃষ্টিধর্মী মন না থেকে 'হ্যাঁ'-এর দিকে অগ্রসর হলো, কুৎসিত বর্তমানকে অতিক্রম করে সম্ভাবনাময় আদর্শ ভবিষ্যতের কোঠায় স্থান লাভ করল; বর্তমানকে ভবিষ্যতে প্রসারিত করল। কালকেতু চণ্ডীর আশীর্বাদে নতুন রাজ্য স্থাপন করল; সেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই কোন অমর্যাদা হবে না; কোন অকল্যাণবুদ্ধিই সেখানে জয়যুক্ত হবে না; সেখানে চাওয়া বৃথা আশায় কেঁদে কুটে মরবে না সার্থক পাওয়ায় পরিণতি হবে।"[২৩]

চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কে যেন একটা মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। এই মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে যা চাওয়া যায় তাই যেন পাওয়া যায়—

"মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী

মূর্চ্ছা তেজি উঠ পুত্র তেজিয়া ধরণী।।

উঠ উঠ ফুল্লরা বলেন মহামায়া।

বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া।।

দেবীর বচনে উঠে ব্যাধের কোঙর।

সম্মুখে রহিল বীর যুড়ি দুই কর।।

প্রদক্ষিণ করি বীর করে নমস্কার।

ফুল্লরা সুন্দরী দেয় জয়জয়কার।।

কৃতাঞ্জলি করিয়া বলেন বীর বাণী।

ত্যজ ভয়ঙ্কর মূর্তি নগেন্দ্রনন্দিনী।।

এতেক বচন যদি বলে মহাবীর।

দেখিতে দেখিতে হইল পূর্ব্বের শরীর।।

অভয়া দিলেন তারে মাণিক অঙ্গুরী।

লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।।

একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন কাম।

সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।।

... ...

চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন।

নগরের মধ্যে দিবে আমার ভবন।।

পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।

গুজরাট নগরের হবে তুমি নাথ।।

স্থাপিয়া আমার বারি করিও পূজন।

নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ।।

এত শুনি মহাবীর চণ্ডীর ভারতী।

কৃতাঞ্জলি হৈয়া বলে শুন গো পার্বতী।।

অতি নীচ-কুলে জন্ম জাতি গো চোয়াড়।

কেহো না পরশে জল লোকে বলে রাঢ়।।

পুরোধা আমার হবে কেমনে ব্রাহ্মণ।

নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহুধন।।

অম্বিকা বলনে কিছু ব্যাধের নন্দনে।

পবিত্র হইলে মোর পদ-দরশনে।।

লইবে তোমার ধন উত্তম ব্রাহ্মণ।

এতেক বলিয়া চণ্ডী করিলা গমন।।"[২৪]

তাহলে ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার মনেও এই ভয় ছিল পাওয়া ধন যদি হারিয়ে যায়। আসলে মধ্যযুগের মানুষের মনে এই ভয় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল কারণ ষোড়শ শতাব্দীতে "*কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করেছিলেন সেখানেও ছিল অত্যাচার। বোধ হয় রাজস্বকেই কেন্দ্র করে বর্ধমানের দামিন্যাতে দেখা দিয়েছিল অর্থনৈতিক গোলযোগ। বিপর্যয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে অত্যাচারী উজির ও রক্তচক্ষু ডিহিদারের দাপটে।*"[২৫] তাই মানুষের অন্তর্জীবনে একটা ভয় সবসময়ই তাড়া করেছে। এই ভয় মৃত্যুর ভয়, ভয় হারাবার ভয়। এরকম ভয়ই তাড়া করেছিল কালকেতু ও ফুল্লরাকে। ষোড়শ শতাব্দী ছিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল। যাঁর আবির্ভাবে সর্বত্র প্রেমভক্তির আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল; কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও এই প্রেমভক্তিই কালকেতুর মধ্যে দেখিয়েছিলেন। দেবী যখন কালকেতুকে বর দিলেন যে ব্রাহ্মণরাও তার কাছে আসবে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মের মূল কথা যে জাতিভেদ বর্ণপ্রথা কোথাও থাকবে না এরূপই সমাজের সৃষ্টি কালকেতুর মধ্য দিয়ে হয়েছিল।

কালকেতু নিম্নবংশের ছিল তাই সাধারণভাবেই সে প্রশ্ন করেছিল 'নীচ কি উত্তম হয় পাইলে ধন?' দেবী তাই বর দিয়ে বলেছেন– উত্তম ব্রাহ্মণ তোমার কাছ থেকে ধন নেবে। কালকেতু ও দেবীর কথোপকথন তা যেন নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই কথোপকথন যে কথোপকথনের মধ্যে সমাজের অন্তরের কথা উঠে এসেছে। "*মধ্যযুগীয় সামাজিক জীবনের ভিত্তি ছিল বর্ণ ও বৃত্তির ভেদ। হিন্দু সমাজ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ছিল। নানা পেশায় নিযুক্ত মানুষ ও তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দেখে ধারণা হয় সেকালের গ্রাম সমাজগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আধুনিক নগরবিন্যাসের জটিলতা থেকে মুক্ত। সামন্ত প্রভুরা চাইতেন তাঁদের সরহদকে ঘিরে শিল্প-ব্যবসা-*

বাণিজ্য ও সাহিত্যকলা গড়ে উঠুক। এজন্য নানা বৃত্তিজীবী মানুষদের দাদন দেওয়া ও বেতনভোগী কারিগর এবং কবির ভূমিদান প্রথা গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণরা যজন-যাজনের জন্য পেতেন ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি। সর্বস্তরের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠত রাজ্যের কল্যাণ। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদায় আত্মতৃপ্ত ছিল বলেই গ্রামের শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় শাসক দলের বদল কোন আবর্ত সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ গ্রাম সমাজের মানুষেরা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে, আচার- অনুষ্ঠানে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে-ব্রতে যেসব নিয়ম মেনে চলত স্মৃতিশাস্ত্রে তাদের স্বীকৃতি থাকলেও অনুসৃত হত বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যে।"[২৬]

তাই কালকেতুর মনেও এই ভয় ছিল যে সে নীচ বংশে জন্ম নিয়েছে বলে চিরকালই তাকে সেই বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যে চলতে হবে। তবে দেবী চণ্ডী তার ভয়কে অভয় দিলেন—

"কি আর জিজ্ঞাসা কর　　　　আইলাঙ তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ
দিআ আমার ধন　　　　তুসিব বীরের মন
আজি হইতে বড় পাবে সুখ।

... ...

খাও পর জত তুমি　　　　সকল জোগাব আমি
না বাসিহ তুমি মোরে ভিন
সমর কানন ভাগে　　　　থাকিব বীরের আগে
আজি হইতে সম্পদের চিন।
শতেক রাজার ধন　　　　গায় মোর অভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে
সম্পদ বিস্তর দিব　　　　ভক্তি কেবল নিব
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে।"[২৭]

তাহলে এই পংক্তি থেকে আমরা একটা সূত্র খুঁজে পাই যে, দেবী চণ্ডীও শর্তের বেড়াজালে কালকেতু ও ফুল্লরাকে বেঁধে দিয়েছিলেন। এই শর্ত তখনকার জমিদাররাও প্রজাদের জন্য বেঁধে দিয়েছিল; বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে প্রজারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও এভাবে নিজের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। "*মুঘল আমলে জমিদারদের কাজ ছিল দ্বিবিধ ঃ শাসন সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায়। জমিদারী সনন্দ দানের প্রথাও চালু হয়েছিল এসময়। জমিদারীর যথেচ্ছ উচ্ছেদের ক্ষমতা মুঘল বাদশাহের হাতে ন্যস্ত থাকলেও দেশাচার অনুসারে উত্তরাধিকারীরাই জমিদার হতে পারতেন। তবে জমিদারের বংশধরদেরও নতুন করে সনন্দ নিতে হত। আগেকার দণ্ডপাটগুলিকে ভাঙাগড়া করে নতুন মহাল বানানো হলেও তোতরমল কোনও কোনও মহালে প্রাচীন ভূ-স্বামীদের বংশধরকেই মুঘল-অধীন জমিদাররূপে বহাল রেখেছিলেন। যদিও এইসব জমিদাররা বুঝেছিলেন আফগান আমলের স্বেচ্ছাচার এখন আর চলবে না। ... সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্ক অনেকটা খাদ্য-খাদকের। জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন জমিদার। মুঘল আমলের জমিদার সংস্থাকে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রদান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ জমি ও তার ভোগাধিকারে উচ্চতম যে সকল স্বার্থ জড়িত ছিল জমিদার সংস্থা তাদের প্রতিনিধিত্ব করত। জমিদারের দায়বদ্ধতা থাকে সম্রাট বা রাজার কাছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব দানের বিনিময়ে তিনি পেয়ে থাকেন জমিদার ছাড়পত্র বা সনদ। প্রজারা শোষিত হত ধার্য রাজস্বে, অতিরিক্ত কর বা আবওয়াবে এবং রাজকর্মচারীদের লালসাপূর্ণ জুলুমে।*"[২৮]

সুতরাং জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক এভাবেই শোষণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। তবে দেবী চণ্ডী, কালকেতু ও ফুল্লরার উপরে কোন ধরনের শোষণ করেননি বরং তাদের চাহিদানুসারেই সংসারের অভাব অনেকটা দূর করে দিয়েছেন। "*গোধিকা রূপে তিনি কালকেতুর হাতে বন্দী হয়ে তার কুটিরে এসেছেন। ফুল্লরা এসে দেখল রত্ন বিভূষিতা এক সুন্দরী নারী। ভাবল বড়লোকের বধূকে কালকেতু ধরে এনেছে। দেবী তার ভুলটি সোজা কথায় ভেঙ্গে দিলেন না। অনেকক্ষণ কথার ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে তাঁকে নিয়ে কৌতুক করলেন এমনভাবে যাতে সত্যও বলা হয়। আবার ফুল্লরার মনে সতীনভীতিও বৃদ্ধি পায়। ফুল্লরাকে নিয়ে এই যে রঙ্গরসিকতা করার*

মনোভাব তাতেই চণ্ডীর এই রূপটি খুব মানবিক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"[২৯]

কারণ জীবন খুব বেশি দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা অভাবে পরিপূর্ণ হলে সেই জীবনকে এই সমস্ত দুঃখের হাত থেকে সাময়িক মুক্তি দান করে সুখের জোয়ারে ভাসানো যায় একমাত্র রঙ্গ-রসিকতা ও কৌতুকের মাধ্যমে, ফুল্লরার জীবন যে দুঃখের কষ্টিপাথরে আহত হয়েছিল; তাই দেবী চণ্ডী হয়তো সামান্য রসিকতা করে এই কষ্টিপাথরের ওজনকে যেন হাল্কা করতে চেয়েছেন। ফুল্লরার জীবনের দুঃখ দেবী চণ্ডী লাঘব করতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফুল্লরা তার দুঃখময় জীবনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি, কারণ স্বামীর সুখেই সুখ, স্বামীর দুঃখেই দুঃখ– ফুল্লরা প্রকৃত সহধর্মিণী হিসেবে সে কথাটি ভালভাবেই বুঝেছিল। স্বামীর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ফুল্লরা, সংসারে যে অভাব রয়েছে বা স্বামী যে তার সংসারের অভাব পূরণে সমর্থ নয় তা ফুল্লরা কোনদিনই কারো কাছে ব্যক্ত করেনি। মনের গভীরে সেই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তকাহিনি লুকিয়ে রেখেছে। এখানে বিখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ সিমোন দ্য বেভোয়ার কথাটি মনে পড়ে "*কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে*"[৩০] – অর্থাৎ একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে ধীরে ধীরে নারী করে তোলা হয়, তার চারিদিক সেভাবেই তৈরি করা হয়ে থাকে। ফুল্লরাকেও হয়তো এই নারী হিসাবে জন্মের জন্য উপহার স্বরূপ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, স্ত্রীকে বিনা প্রতিবাদে স্বামীর সর্বাবস্থায়ই তার সহায়তা এবং সঙ্গ দিতে হবে; স্বামী যেহেতু সংসারের মূল কেন্দ্র, তাই আজীবন ঐ কেন্দ্রের আশ্রিত বৃত্তেই ঘুরতে হবে তা না হলে নারীজীবন সার্থক হয় না। এমন ধারণাই সমাজে মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। তাই সে বলতে পেরেছে—

"তোরে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় দুঃখ
শূন হেদে মূঢ়মতি যদি ছাড়ে নিজ পতি
কেমনে চাহিবে লোকমুখ।
স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা

স্বামী পরম ধন বিনে স্বামী অন্যজন

কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা।"[৩১]

ফুল্লরা এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণাকে তার মনে যেন গ্রথিত করে রেখেছিল। সংসারে অভাব লেগেই আছে কিন্তু স্বামীর নজরে এই অভাব ফুল্লরা কোনদিনই আনতে চায়নি, কারণ স্ত্রী ধর্মের এই শিক্ষা সে পেয়ে এসেছে – এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েই কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ হয়–

"সুবেশে ফুল্লরা নারী সঙ্গে সখি পাঁচ চারি

বসিলা পিতার সন্নিধান।

ব্রাহ্মণ বসিল পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে

গণেশ করিল আবাহন

... ...

মুকুট মণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর

বন্দে কালু দ্বিজের চরণ।

... ...

গমনের শুভ বেলা বাউড়ি জোগায় দোলা

তথি বীর কৈল আরোহণ

বরযাত্রী পড়ে সাড়া ঢেমচা দগড়ি পড়া

বর বেড়ি করত্র গমন।

কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল"[৩২]

বিবাহের যে সম্পর্ক তা স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই গড়ে উঠে; কিন্তু ফুল্লরার ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিজে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করেও স্বামীকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা যা নারী ধর্মে পর্যবসিত—

"ঘরে হইতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া

সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।

মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল

ঝাট জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।

পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখ

ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।

সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা

... ...

এক শ্বাসে তিন হাণ্ডী আমানী উজাড়ে।

চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ

ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আঁচমনে

নিশাকাল হৈল বীর রহিল শয়নে।"[৩৩]

কালকেতুর সংসারে অভাব তা সত্ত্বেও তার আহারে কোন ধরনের অভাব লক্ষ্য করা যায় না। সে পেট পুরে খেয়েই যাচ্ছে কিন্তু একবারের জন্যও তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে না, স্ত্রী আহার করল কি না? এটাইতো মধ্যযুগীয় সমাজেরই রীতি – যেখানে স্ত্রীর জন্য স্বামীর কোনো ধরণের চিন্তা থাকতে পারে না। অথচ স্ত্রী ফুল্লরা স্বামীকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলেছে, এমনকি মাংসের পসরা বাজারে নিয়ে গিয়ে বসেছে উপার্জনের জন্য, সংসারের অভাব মেটানোর চেষ্টা করেছে যা নারীকেই ভাবায় বেশি। তবুও ফুল্লরার কোনধরনের খবর কালকেতু রাখে নি। তথাপি ফুল্লরা যখন রূপসী মেয়ের কথা বলে যে কালকেতুর জন্য এসেছে তখন—

"*সবিস্ময় হইআ জিজ্ঞাসা করে বীর।*

সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা

কা সনে কন্দল করি চক্ষু, কৈলে রাতা।

সতা সতা নহে প্রাণনাথ মোর সতা

ইবে ফুল্লরার হৈল বিমুখ বিধাতা।

পিপিড়ায় পাক উঠে মরিবার তরে

কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।"[৩৪]

স্বামীর ঘরে অন্য কারোর হস্তক্ষেপ ফুল্লরা বরদাস্ত করতে পারে না, তাই কটুবাক্যে স্বামীকে দোষারূপ করেছে। তবে একথাও সত্যি যে, "*প্রাত্যহিক দারিদ্র্যদুঃখ নিয়ে বিনিয়ে কাঁদার মতো চরিত্র তার নয়। তার বারমাস্যার দুঃখের গান অন্য উপাদানে গড়া, ভিন্নতর বয়সের আশ্রয়। ফুল্লরা দারিদ্র্যের বেদনা নিয়ে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল বলে ভাবে না। কিন্তু সতীন নিয়ে জীবনযাপনে তার কঠিন আতঙ্ক আছে। এই আতঙ্কই তাকে প্রত্যুৎপন্নমুতিত্ব এবং অশিক্ষিত পটুত্ব দান করেছিল। ... ফুল্লরার নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে কিছু উচ্চধারণা ছিল। ছদ্মবেশী চণ্ডীকে নানা উপদেশ ও নীতিকথায় যখন বিদায় গেল না তখন সে দারিদ্র্যের পল্লবিত বর্ণনা শুরু করল। কিন্তু সে কৌশলও যখন ব্যর্থ হল তখন ব্যাকুল হয়ে গোলাহাটে কালকেতুর কাছে গিয়ে হাজির হল।"*[৩৫]

ফুল্লরা যতই নিজেকে দৃঢ়মনা দেখাতে চেষ্টা করুক তথাপি ফুল্লরা মনে মনে অন্তর্জীবনে খেদ প্রকাশ করেছে—

"*বিধাতা আমারে দণ্ডী জিয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী*

কৈল দৈবে দুঃখের ভাজন।

কপালে আঘাত হানি কান্দে ব্যাধনন্দিনী

নিশ্বাসে মলিন মুখ চাঁন্দে

দারুণ দৈবের গতি সকলে দরিদ্র পতি

পড়িনু সম্বলচিন্তা ফাঁদে।

অন্নবস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিন হেন বরে

কর্ণবেদ জাত্যের বেভোরে"[৩৬]

সমাজ নারীর মনকে এভাবেই তৈরি করে নেয়, যেখানে খেদটাও প্রকাশ পায় অন্তর্জীবনে নীরবে, তার নীরবতা ভঙ্গ করার নিয়ম নেই। কবি মুকুন্দ অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংসারের প্রতিনিয়ত অভাব-অনটন মানুষকে বিপর্যস্ত করে দেয়। দাম্পত্য সম্পর্কেও লাভ হয় তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফুল্লরার বারোমাসের অন্তর আর্তি প্রকাশে সমাজের অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে মুকুন্দের রচনায়। ফুল্লরার মুখ থেকে শোনা যায় –

“ফুল্লরার আছে কত কর্মের ফল

মাটিয়া পাথরা বিনে নাহি অন্যস্থল।

দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।

মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ

মালতিয়ে মধু পান করে মকরন্দ।

বনিতা পুরুষ অঙ্গ পিড় এ মদন

আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।

দুঃখ কহিব কাহারে দুঃখ কহিব কাহারে

স্বামী সনে একশয্যা কোসেক অন্তরে।”[৩৭]

বলা যায়, ফুল্লরা এবং কালকেতুর দাম্পত্য সম্পর্কও খুব ভাল ছিল না; কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে যে নিবিড়তা বা নিগূঢ় বন্ধন কোথাও ছিল না, ফুল্লরা তা কোনদিনই কাউকে বোঝায়নি। এমনকি স্বামীকেও মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কথায় আছে নারীদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। ফুল্লরাও যেন এমনই এক নারী, যার বুক তো ফাটে, কিন্তু মুখ ফোটে না। স্বামীকে বেষ্টন করে থাকাই নারীর কর্তব্য। ফুল্লরার ক্ষেত্রেও তাই ছিল বাস্তব। “*... তাকে গৃহকার্যও করতে হয়। হাটে বিকিকিনি সেরে তাকে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করতে হয় পতিব্রতা রমণী হিসেবে স্বামীকে খাবার*

দিতে হয়। এছাড়া আগের দিনের বাসী মাংস হাটে নিয়ে বিক্রির চেষ্টা সে করে। যেদিন কালকেতু শিকার পায় না, সেদিন এই দরিদ্র ব্যাধ দম্পতির অন্নচিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে।"[৩৮]

সংসারে খাবার জন্যই যত লড়াই, যত সংগ্রাম, দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করবে বলেই সেই ব্যাধ দম্পতির শুধু চিন্তা। কারণ আর্থিক অবস্থা এত উন্নত নয় যে তারা আরামে স্বস্তিতে দিনযাপন করবে। সংসারে অভাব যখন তার কঠিন আঘাতে সবাইকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তখন কোন দাম্পত্য সম্পর্কই সুন্দরভাবে টিকে থাকতে পারে না, কালকেতু এবং ফুল্লরার সম্পর্কেও তাই অভাবের কষ্টিপাথরের আঘাতে ধীরে ধীরে ফাটল দেখা দিতে শুরু করে। "*মধ্যযুগে নারীরা স্বাধীন ছিল না, এমন ধারণা সুপ্রচলিত। ... নিম্নবর্গের নারীরা বাইরের কাজে পটু। ... সতীত্ব অসতীত্ব নিয়ে সেকালেও সমস্যা ছিল। ... সতীন সমস্যাও এক বড় সমস্যা। এর মূলে ছিল পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা। এখানে নারীর ইচ্ছার মূল্য দেওয়া হতো না। বাবা মা যেমন মেয়ের অমতে যে কোন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতেন, তেমনি স্বামীরা এক স্ত্রী থাকলেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করত। ফুল্লরার বিয়ে হয়েছে তার অনিচ্ছায়। তবে স্বামী যাতে অন্য স্ত্রী ঘরে না আনে, তার জন্য দেবী চণ্ডীকে সে কত কথাও শুনিয়েছে।"*[৩৯]

স্বামীর প্রেম বা ভালবাসা অন্য কোন নারীর সঙ্গে সে ভোগ করে নিতে চায় না, তাই ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে সতীন ভেবে ভয় পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কৌশলে তাকে তাড়ানোর ব্যবস্থাও করেছে। সতীন তখনকার সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবনের কাঁটা বলেই বিবেচিত হত। ফুল্লরাও সেই কাঁটা তার জীবনে বিঁধতে না দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আগেই তাকে বের করার বুদ্ধি করেছে। তবে ফুল্লরা যেহেতু ব্যাধ রমণী, তার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ভাব লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু তথাপি কবি বারবারই বাঙালি বধূ রূপে যেন ফুল্লরাকে গড়ে নিতে চেয়েছেন। ফুল্লরা তার সংসারকে সুন্দর করে গড়তে চেয়েছিল, একজন স্ত্রী যেভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল থাকে; ফুল্লরাও সেভাবেই নির্ভরশীল ছিল। "*দারিদ্র্যের জন্য ফুল্লরা কালকেতুকে দায়ী করতেই পারতো। কেননা সংসারের স্বচ্ছলতা মূলত নির্ভর করে স্বামীর উপর। অনার্য সমাজে স্ত্রী যদিও স্বামীর জীবিকার যোগ্য সহযোগী হয়ে ওঠে, তবুও সংসারের মূল দায় বর্তায় স্বামীতেই। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুকে কোনোভাবেই দায়ী করেনি। ফুল্লরার দারিদ্র্য দুঃখ সহনের ক্ষমতাটা লুকিয়ে ছিল তার একনিষ্ঠ স্বামী প্রেমেই। এই*

একটি অস্ত্রেই সে জয় করে নিয়েছে বুভুক্ষার যন্ত্রণা।"[৪০]

ফুল্লরা স্বামীর সেবায় সদা মগ্ন, এমন কি স্বামীর সংসারে অভাব মেটানোর জন্য নিজেই অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য পসরা নিয়ে পথে নেমেছে মাংস বিক্রির জন্য। মধ্যযুগীয় সমাজ ভাবনায় নারীকে যেভাবে তৈরি করা প্রয়োজন কবি মুকুন্দ সেভাবেই ফুল্লরাকে তৈরি করেছেন। কারণ সমাজের প্রতিফলন সাহিত্যের দর্পণে পড়বেই। কবিরাও এই সমাজের সন্তান, সমাজ বহির্ভূত কেউ নয়, তাই সমাজ নামক মানুষের সমুদ্র থেকেই এক একটা মুক্তা তুলে নিয়ে আসেন। এমনই মুক্তারূপ ফুল্লরার অন্তরে স্বামী কালকেতুর জন্য অগাধ ভালবাসা রয়েছে। *"... কালকেতুর যোগ্য পত্নী ফুল্লরা... ফুল্লরা নামটিও উপযুক্ত। ... ফুলের মতো যে মৃদু ও কোমল সেই ফুল্লরা। কিন্তু অন্যদিকে ফুল্ল যার রা অর্থাৎ যে নারী মুখরা বা বেশি কথা বলে সেই ফুল্লরা ভাবা যায়। পসারিণী বা ব্যাধকন্যার এমন নামই সুপ্রযুক্ত মনে হয়। কবি ফুল্লরাকে আদর্শ গৃহবধূ করেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি তাই বধূকে ভালোবাসে। স্বামীর প্রতি তার প্রেমও গভীর। বন থেকে কালকেতু ফিরলে তার খাবার ব্যবস্থা, সেবার ব্যবস্থা সে করে। স্বামীর জন্য এই সম্ভ্রমটুকু তাকে অনন্যা করেছে। সতীন চণ্ডীকে তাড়াবার জন্য তার আকুলতা, কৌশল, স্বামীর কাছে তীব্র অনুযোগ তার পত্নী মহিমা উজ্জ্বল করে তুলেছে। আবার সে যে ব্যাধ নারী মাত্র বোঝা যায়, যখন চণ্ডীর দেওয়া ধনসম্পদ আগলে বসে থাকে। তার বুদ্ধি কতখানি বৈষয়িক কবি তাও দেখিয়েছেন। চণ্ডী শুধু একটি আংটি দিলে ফুল্লরা বলে, 'একটি অঙ্গুরী নিলে হবে কোন কাম।' সংসার চালায় যে নারী সেই জানে অর্থের ভূমিকা কি। ফুল্লরা ছাড়া কালকেতু অসম্পূর্ণ।"*[৪১]

তাহলে বলা যায় নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। সংসারের অর্থের সঠিক মূল্যায়ন যেন নারীই করতে পারে। ফুল্লরা ছাড়া কালকেতু যে সম্পূর্ণ নয় তা কালকেতুর আচার-আচরণে কখনোই বুঝা যায়নি, তার গায়ের জোর প্রচণ্ড। এই গায়ের জোরেই যেন সে সমস্ত কিছু জয় করে নিতে চায়। *"একজন অরণ্যচারী ব্যাধ অস্বাভাবিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; কিন্তু তার জীবনের মূল্যই বাকি, অরণ্যের মূল্যই বা কি; তাই অকারণ বিরোধের বিশৃঙ্খলাকে ডেকে এনে লাভ কি; মিষ্টি কথায় তাকে খুসী করাই বিধেয়, বিশেষ করে তার দাবী যখন উল্লেখযোগ্য রকমের ভীতিপ্রদ কিছু নয়। কলিঙ্গ রাজ কর্তৃক কালকেতুর স্বীকৃতিটা যেন অনেকটা এমনি ধরনের। ... প্রচলিত*

সমাজে তখনও সে আসন লাভ করেনি। তার সামাজিক সম্মাননা বা স্বীকৃতি কিছুই নেই। সমাজে অধিষ্ঠান তখন তার নিকট দুরাশা। অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে তার আদর্শ রাজ্যও সমাজ; সেখানকার নিয়মকানুন দিয়ে কলিঙ্গ প্রভাবিত হবে না, অথবা কলিঙ্গের প্রভাবও গুজরাটে অনুভূত হবে না। পারস্পরিক সম্পর্কের এই সমাধান কলিঙ্গে দিক থেকে শ্রেয়। চণ্ডীর মাহাত্ম্যের ও কালকেতুর দিক থেকে অর্থাৎ অনার্য সম্প্রদায়ের প্রাণধর্মী জীবন দর্শনের দিক থেকে আরও বহু স্বীকৃতি লাভের পূর্বে এই সমাধান অশুভ নয়, বিশেষত যেখানে সে পরাজিত। পরাজয়ের মধ্যে এই বিজয় তার আরও গভীর স্বীকৃতির সূচনা মাত্র।"[৪২]

সুতরাং, যে গুজরাট নগর প্রতিস্থাপন হল তাতে প্রজাদের দুঃখ, দারিদ্র্য বলে কিছু থাকবে না, কারণ কালকেতু ও ফুল্লরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে দারিদ্র্যতা অনুভব করেছে। তাদেরকে যেন একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। তবে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথও দেবী চণ্ডী তৈরি করে দিয়েছেন।

তাছাড়া সম্পর্কের যে মেলবন্ধন তা শুধু মানুষের মধ্যে নয়, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পশুদের মধ্যেও এই সম্পর্কের অন্তর্বয়ন লক্ষ্য করা যায়। পশুদের শিকার করে কালকেতু তাদের অনিষ্ট সাধন করেছে, তাতে তাদের মনে মর্মবেদনা চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পেয়েছে—

"*কান্দে সিংহ আদি পশু সঙরি অভয়া*

অপরাধ বিনে মাতা দূর কৈলে দয়া।

... ...

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক

উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।

... ...

পতি মইল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।

দিত অভাগির এক পেট রাড় পো

চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি

মাগু মৈল তথি বুড়া জিয়া কাজ কী।”[৪৩]

পশুদের মধ্যেও যে হৃদয়ের আর্তি, সম্পর্কের বেদনা সমস্ত কিছুই লক্ষ করা যায়—

“*বাঘিনী বলেন কথা কালকেতু দিল বেথা*

স্বামীরে বাধিল একবাণে।”[৪৪]

এইভাবে কালকেতু পশুদের শিকার করে তাদের জীবনে দুঃখের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটিয়েছিল, তবে দেবী চণ্ডী তাদের অভয় দিয়েছেন। স্বামীর অনুপস্থিতি স্ত্রীর জীবনে কি ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা সেই বাঘিনীর অন্তরের বয়নেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে থাকতে থাকতে কোনো কোনো সময় এমন অনুভূত হয় যে, সমস্ত নিয়মের বেড়াজাল যেন নিমেষের মধ্যে ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ‘ডাকঘর’ নাটকের অমলের কথা বলতে পারি, যে অমল নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে চায়নি – আর চায়নি বলেই নিজের একটা ভিন্নজগত তৈরি করেছিল – যে জগতে শান্তি শুধুই শান্তি। কালকেতুও যেন এভাবে একটি ভিন্ন গুজরাটনগর প্রতিস্থাপন করল। “*মানুষ যেদিন সভ্য হতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সে বন কেটে বসতি বানিয়েছে, গৃহস্থ হতে চেয়েছে। একটি সমাজ ও পরিমণ্ডল গড়তে চেয়েছে। বিচ্ছিন্নতা কিংবা বন্য হাওয়ার মধ্যে প্রাচীনতা আছে। ... বন কেটে কালকেতু নতুন নগরী স্থাপন করলে দলে দলে লোকে ভিড় করেছে বসবাসের জন্য।*”[৪৫] সভ্য মানুষ সকলেরই মঙ্গল কামনা করে বাঁচতে চায়, অর্থাৎ সকলের মধ্যে সমান অধিকার বজায় থাকুক এই ভাবনা নিয়ে গুজরাট নগর পত্তন হয়—

“*ধন দিআ কাটাইলে গুজরাট বন*

কি কারণে এতগুলা তোলাইলে ভবন।

প্রজাকে আনিতে নারি আমার সবাতি

নগর বসাইতে মাতা উর গো ভগবতী।”[৪৬]

দেবী চণ্ডীর কাছে এভাবেই কালকেতুর প্রার্থনা দেখা যায়। আসলে কালকেতু অভাব-দারিদ্রের বিষবাষ্পে অনবরত শোষিত হয়ে এসেছিল। মুরারীশীল কালকেতুর উপর আর্থিক শোষণ করেছে, দেবীর দেওয়া অঙ্গুরির যথার্থ মূল্য সে দিতে চায়নি, কারণ সে কালকেতুর নিকটে নিজের লাভের আশা করেছিল। পরবর্তিতে দেবীর আদেশে উপযুক্ত মূল্য সে কালকেতুকে দিতে বাধ্য হয়। মানুষের যতই ক্ষমতা থাকুক, ভয় মানুষের মধ্যে ছিল, তাই মুরারীও নিজের পরিবারের কল্যাণের কথা ভেবেই মূল্য দিতে রাজী হয়। মুরারীর স্ত্রীও তার স্বামীর সঙ্গ দিয়েছিল ; সে প্রথমে কালকেতুকে বলে যে তার স্বামী মুরারী ঘরে নেই– তা যেন মধ্যযুগের রীতিতেই ছিল যে, ভাল-মন্দ সমস্ত পরিস্থিতিতেই স্বামীর সহযোগিতা করা –

"বীরের বচন শুনি আসি বলে বান্যানি
ঘরে নাহি সহর–পোতদার।
সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাতকপাড়া
কালিদিব মাংসের ধার।"[৪৭]

মুরারীশীল ধার মিটিয়ে দেবার ভয়ে লুকিয়েছিল, সেই লোভে, নিজের পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আর গোপন থাকতে পারল না –

"এমন সময় হইল আকাশে ভারতী
বীরের লইতে ধন না করিহ মতি।
সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরির মূল
চণ্ডিকা দিআছেন বীরে হইআ অনুকূল।
অকপটে সাতকোটি টাকা দেহ বীরে
বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে।"[৪৮]

তাহলে বলা যায়, ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস, লোভ এই সমস্ত কিছুর বশবর্তী হয়েই দুঃশীল মুরারীশীল বাধ্য হয়েছিল আর্থিক শোষণের উপর যবনিকা টানতে। আসলে বণিক সমাজ মূলতই খুব বেশি

সুবিধা ভোগী। সুযোগ নেওয়া তাদের ভালোই জানা আছে, তা সেই সমাজেরই দান। শোষণ সহ্য করতে করতে সেই শোষণ থেকে উত্তরণের পথও মানুষ খুঁজে নেয়। কালকেতু এমন নগর প্রতিস্থাপন করল যেখানে কোন শোষণ, বঞ্চনা নেই এবং সকলের সম্মানের কথা চিন্তা করা হয়। তাই কালকেতুকে বলতে শুনি –

"শুন ভাই বুলান মণ্ডল

আইস আমার পুর　　　　সন্তাপ কবির দূর

কানে দিব হেমকুণ্ডল।

আমার নগরে বৈস　　　　জত ভূমি চাষ চষ

সাত সন বই দিয় কর

... ...

ডিহিদার নাহি দিব দেশে

... ...

জত বৈসে দ্বিজবর　　　　তার নাহি নিব কর

চাষভূমি বাড়ি দিব দান

হইয়া ব্রাহ্মণের দাস　　　　পুরিব সভার আশ

জনে জনে সাধিব সম্মান।"[৪৯]

এই সমস্ত কথা থেকে বুঝা যায়, কালকেতু এমন একটা নগরের উপস্থাপনা করেছে যেখানে কোন শোষণ নেই, বঞ্চনা নেই, ডিহিদার নেই, যে ডিহিদার প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করে। এই নগরে সকলের সম্মানের চিন্তা সমানভাবে করা হবে। এরকম নগর নির্মাণ করাও অত সহজ ছিল না, যেখানে ভাঁড়ু দত্তের মত লোকেরা বাস করে। মানুষ যদি নিজের থেকে অন্য কাউকে উঠতে দেখে, তখন তার মনে স্বাভাবিকভাবে ঈর্ষা জন্ম নেয়। আর যেখানে ভাঁড়ুদত্তের

মত লোক যে তার জীবনে সামান্য সম্মানটুকু পায়নি সেখানে অন্য কাউকে সম্মান দান তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যখন ভাঁড়ুদত্ত দেখতে পায় কালকেতুকে প্রজারা সম্মান দিচ্ছে, তা তার ভাল লাগেনি। তাই কালকেতুকে প্রজা শোষণের উপদেশ দেয়। আসলে মানুষ ভালমন্দের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের মধ্যে যদি শুধুই ভালো গুণ থাকে; তাহলে তো সে দেবতাতুল্য হয়ে যেত। তাই গুজরাট নগর প্রতিস্থাপন করার পরও তার মধ্যে ভাঁড়ুদত্তের মত লোক থাকতে পারে; তার মত লোকের জন্যই কালকেতুকে কলিঙ্গরাজের কাছে বন্দী হতে হয়। কারণ ক্ষমতায় যে থাকে সে সমস্ত কিছুই যেন ভালো কখনোই করতে পারে না; তাই কালকেতুকে বেড়াজালে আটকে যেতে হয়।

কিন্তু এমন নগর বানিয়ে কালকেতু তার জীবনে আগে যা পেয়েছিল, তা সমস্তই যেন হারিয়ে ফেলেছে – "*ব্যাধবৃত্তিতে তার শান্তি লুকিয়েছিল অরণ্যের মাঝে, ফুল্লরার ভালবাসায়, জীবিকা ও ইচ্ছার স্বাধীনতায়। কিন্তু রাজাগিরিতে সে হারিয়ে ফেলেছে দুঃখ বৈভব, দাম্পত্য সম্বন্ধ, মাটির প্রতি মমত্ববোধ। কবি একবারও রাজার পাশে রাণীকে দেখাননি রাজকীয় বিলাসের হর্ম্য সিংহাসনে, বরং ফুল্লরাকে টেনে আনেন বিপন্ন কালকেতুর সামনে তার দুঃখের অংশীদার হিসেবে, কোটালের কাছে আর্তি জানায় স্বামীর প্রাণভিক্ষার। বস্তুত কালকেতু ধনের মর্ম অনেক আগেই বুঝেছে। সহজ সরলভাবে নিরুপদ্রব জীবনযাপনের তুলনায় সদাসশঙ্ক রাজৈশ্বর্যভোগ যে তুচ্ছ এবং দেবী রাজ্য দান করে কৃপার বদলে যে বিড়ম্বনাই সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়ে তার ধারণা পাকা হয়েছে। ... হিংসা বা ঈর্ষা নয়, বরং নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট মর্যাদা ও গর্ববোধ তার সকল দুঃখ জয়ের মূলে ছিল।*"[৫০]

আসলে কোন মানুষের জীবনেই দুঃখ চিরকাল স্থায়ী থাকতে পারে না। কবি মুকুন্দ সেই দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। দুঃখের পর সুখ আসবেই। সুখ-দুঃখ যেন একই মুদ্রার দুই দিক। পশুদের আর্তনাদের মধ্যে যেন তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা মিলে মিশে রয়েছে দেবী চণ্ডীর কাছে; কিন্তু দেবীর অভয় দানে তাদের দুঃখ দূর হয়েছে। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন হয়তো কবি মুকুন্দের একটা প্রয়াস ছিল, তৎকালীন সমসাময়িক অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। হয়তোবা নিজে সেই দুঃখহীন জীবন গড়ে দিতে চেয়েছেন। কালকেতুর পত্তন করা

গুজরাট নগর ছিল এরূপ– "*চাষী প্রজাদের উপর অত্যাচার করবার জন্য দেশে ডিহিদার থাকবে না। পার্বণে সেলামী আদায় করা হবে না। বাকী খাজনার দায়ে বাড়ি-ঘর বাজেয়াপ্ত হবে না। এককথায় কালকেতুর গুজরাট নগর হয়ে উঠেছিল আধুনিক রাষ্ট্রনীতির ভাষায় ওয়েল ফেয়ার স্টেট।*"[৫১]

অপরদিকে দেখা যায় ধনপতি আখ্যানে দেবী 'মঙ্গলচণ্ডী' অর্থাৎ মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেই দেবীর কৃপাপ্রার্থী হওয়া। তবে ধনপতির তীব্র আপত্তি দেবীকে পূজো দিতে। কারণ "*এই আক্রোশ তার নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, তা সামাজিক। কারণ, তার পরিবারে এই সমাজ-অস্বীকৃত অনার্য স্ত্রী-দেবতার পূজা প্রচলিত হ'লে সামাজিক দিক থেকে তার অধঃপতন অনিবার্য; ধনপতি এ ব্যাপারে তাই অস্বাভাবিক সচেতন।*"[৫২] কিন্তু দেবী চণ্ডীও শান্ত হয়ে বসে থাকার দেবী নন, তিনিও উচ্চসমাজে পূজার জন্য ধনপতিকে ঠিক করলেন। ধনপতির জীবনে দুজন স্ত্রী বর্তমান। লহনা প্রথম স্ত্রী এবং খুল্লনা দ্বিতীয় স্ত্রী। তবে লহনা বর্তমান থাকা অবস্থায় স্বামীর আরেক স্ত্রী বিয়ে করা কোনোমতেই যেন সে মেনে উঠতে পারে না। কারণ স্ত্রীর উপর স্বামী যতই লাঞ্ছনা, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন করুক স্ত্রী তার স্বামীকে অন্য কারো সঙ্গে কখনোই ভোগ করে নিতে চায় না; লহনাও চায়নি।

কিন্তু মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায়, ঘরে একের বেশি স্ত্রী রাখার প্রথা লক্ষ করা যায়। স্বামী ইচ্ছে করলেই তা করতে পারতেন। লহনার স্বামী ধনপতি তা-ই করেছিলেন। নিজ কর্তৃত্বের সংসারে অন্য কারোর কর্তৃত্ব কোন নারীই মেনে নিতে চায় না। "*নারী ব্যক্তিত্ব, আদর্শবোধ, পরিবার গঠনের স্বপ্ন, জীবন সম্পর্কিত ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবধান যতই দুস্তর হোক না কেন; একটি জায়গায় বোধ হয় বেশিরভাগ নারীই সচেতন—তা হল তার স্বামীকে কেন্দ্র করে। স্বামী সম্পর্কে প্রতিটি নারী দুর্বল। স্বামীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা খুবই সচেতন। সেই স্বামীকে অন্য কোন নারীর অধিকার দিতে হবে এটা কল্পনাই করতে পারে না কোন নারী—তা সে শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা, চাকুরিজীবি আর গৃহিনী যাই হোক না কেন। তাই নারী গৃহচারী প্রেম বা স্বাধীন প্রেমের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সাহিত্যে দেখা যায়।*"[৫৩] তাই লহনার মনেও একটা ভয় সবসময় বিরাজ করত, স্বামী ধনপতিকে হারাবার ভয়। এর উপরে সতীন খুল্লনা খুবই রূপসী—

"খুল্লনার রূপ দেখি বলে রম্ভাবতী

আমরা খুল্লনা কন্যা অন্ধারের বাতি"[৫৪]

এহেন রূপসী কন্যাকে তার স্বামী বিয়ে করেছে তাই তার ভয়টা খুব স্বাভাবিকই ছিল। পুরুষরা নারীর রূপেই মুগ্ধ। ধনপতিও খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়েই তাকে বিয়ে করেছিল। লহনা বন্ধ্যা – তার কোন সন্তান নেই। বন্ধ্যা নারীর জীবন যন্ত্রণা লহনাকে অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। "*নিজের বন্ধ্যাত্ব ও বিগত যৌবনা রূপ... অন্যদিকে খুল্লনার স্বভাব সৌন্দর্য তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে এবং তার ফলেই লহনা প্রতিশোধ পরায়ণা এক নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে। যে সর্বনাশ তার জীবনে নেমে এসেছে – খুল্লনা সতীন হওয়ার জন্য, তার বিনাশ ঘটাবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হয়ে খুল্লনাকে ছাগচরানোর কাজে নিযুক্ত করেছে।*"[৫৫] লহনার মনে প্রচণ্ডভাবে ক্ষোভ জমতে থাকে। পুত্রের কামনা করে ধনপতি দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনেন। কারণ পুরুষ ভার্যা সংগ্রহ করে একমাত্র পুত্র সন্তান লাভের জন্য।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "*এস আমরা মিলিত হই যেন পুত্র সন্তানের জন্ম দেই*"[৫৬] কারণ পুত্র বংশ রক্ষা করবে, সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটাবে, খাদ্য ও নিরাপত্তা দান করবে। তাই ধনপতির মনেও এরূপ কামনা ছিল। কারণ সে বড় সদাগর, তার এই ব্যবসা সম্পত্তি দেখার জন্যও একজন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন। এই সমস্ত কারণেই ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়েছেন; কিন্তু যে ঘরে সতীন পূর্ব থেকেই বর্তমান, সেখানে কন্যাদান করতে খুল্লনার মা রম্ভাবতীর ভয়। কারণ লহনাকে তিনি আগে থেকেই জানেন। তার উপর সতীনদের মধ্যে যে কোন্দল হয় এবং সংসার ভেঙে যায় তাও তার জানা ছিল –

"দু তিন সতীন জার বিফল জীবন তার

দিন ব্যর্থ না জায় কন্দলে"[৫৭]

এই কোন্দলের ভয় জেনেও খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিয়ে দেওয়া হয়, কারণ ধনপতি খুব বেশি প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, তাই কন্যাকে সেই বরের কাছেই দান করা হল। তবে ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করলেও প্রথম স্ত্রী লহনাকে ভুলে যাননি; বরং লহনার মন জয়ের চেষ্টা তিনি

করেছেন—

"পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি

পাঁচ পল সোনা দিল পরিবারে চুড়ি।

সাধু বলে প্রিয় তুমি আছ মোর মনে

পূর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।"[৫৮]

তাহলে বলা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কে একজন স্বামীর কাছ থেকে এই সকল কথা শোনা; সম্পর্কের ভিতকে চিনিয়ে দেয়। শাড়ী, চুড়ি সোহাগের সামগ্রী দিয়ে লহনাকে প্রসন্ন করতে চেয়েছেন ধনপতি, সেটাও হয়তো সংসারে কোন্দল না হওয়ার জন্যই। আসলে "*দ্বিতীয় বিবাহের ইচ্ছা সেকালের বহুবিবাহ স্বীকৃতির যুগে সমাজে সুলভ ছিল। ... কিন্তু খুল্লনাকে বিবাহ করতে গিয়ে ধনপতির আচরণ তার চরিত্র দৌর্বল্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।*"[৫৯] স্বামীর মোহে লহনাকে তার অন্তর্জীবনের দুঃখ ভুলে থাকতে হয়েছে। মধ্যযুগীয় রীতিতে নারী জীবন এভাবেই গঠিত হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, "*নিজের সাজানো সংসারে অপরের হস্তক্ষেপ তার বরদাস্ত নয়। ... এহেন পরিস্থিতিতে ধনপতি নিকটে এসে অন্তরঙ্গ হতে চাইলে লহনা স্পষ্টত অভিমান প্রকাশ করে স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে। তখন সদাগর তার দ্বিতীয় বিবাহের কারণ বিবৃত করে এবং আত্মবিস্মৃতা নারীকে সহজেই বুঝিয়ে দেয় তার রূপযৌবনের লালিত্য... চিরতরে হারিয়ে গেছে... লহনার যৌবন পাকশালে বিনষ্ট হয়েছে আর খুল্লনা এখন নবীন-যৌবনা রূপবতী। এটাই ভেতরে ভেতরে লহনা চরিত্রে তৈরি করে গোপন ঈর্ষা। স্বামী অধিকারের নিঃশব্দ প্রতিযোগিতায় খুল্লনা তার লালিত্য ভরা যৌবন দিয়ে পতিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এটা কোনমতেই সহ্য করতে পারে না লহনা। অথচ ধনপতির ভোগলালসার যোগ্য যৌবন-আকর্ষণ নিজের দেহে সৃষ্টি করাও তার আয়ত্তের বাইরে। ফলে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ অসন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলেও রন্ধ্র খুঁজতে থাকে সপত্নী লাঞ্ছনার।*"[৬০]

খুল্লনার প্রতি তার একটা ক্ষোভ অন্তরের মধ্যে দানা বাধতে থাকে। তাছাড়া এই ক্ষোভ পরবর্তিতে কলহ আকারে বৃদ্ধি পায়, ঘরের পুরনো পরিচারিকা দুবলার মন্ত্রণায়। ধনপতি তাঁর

প্রথম পক্ষের স্ত্রী লহনাকে ঘরে রেখে দ্বিতীয়বার খুল্লনাকে বিবাহ করেন। তাতে স্বাভাবিকভাবেই নারীমনে অর্থাৎ লহনার মনে দুঃখের প্রকাশ দেখিয়েছেন কবি মুকুন্দ। সংসারের সমস্ত গার্হস্থ্য সম্পদের উপর এখন ধনপতির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী খুল্লনারও অধিকার থাকবে। এমনকি স্বামী ধনপতির উপরও লহনার সতীন খুল্লনার সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে প্রথমদিকে আমরা প্রেম-প্রীতির সম্পর্কই দেখি –

"দু সতীনে প্রেম বন্ধ দেখিয়া লাগত্র ধন্দ

সুর্বণ জড়িত জেন হিরা।"[৬১]

তবে সমাজে সতীনদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি স্বাভাবিক বলে কেউই মেনে নিত না, সতীনদের মধ্যে কলহ প্রায় ঘরে শোনা যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। লহনা-খুল্লনার মধ্যে সেই কলহে ইন্ধন যুগিয়েছে দুবলা—

"প্রেম বন্ধ দু-সতীনে দেখিআ দুবলা

হৃদে কালকূট বিষ মুখে জেন তুলা।

লহনা খুল্লনা জদি থাকে এক মেলি

পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি।"[৬২]

কিন্তু পরবর্তিতে দেখা যায় এরকমই কালকূট বিষের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। *"স্বামীর দুর্ব্যবহার, পাতিব্রত্যের অপমান, ঈর্ষার জ্বালা আর নষ্ট যৌবনের যন্ত্রণা তাকে পাগল করে তুলল খুল্লনার প্রতি শত্রুতায়। স্বামী-বশের ওষুধ সে সংগ্রহ করলো, আর খুল্লনাকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে বনে পাঠাল ছাগল চরাতে।"*[৬৩]

এই দুর্ভোগের জন্য খুল্লনাকে বিয়ে দিতে মা রম্ভাবতী রাজী ছিলেন না। কিন্তু লক্ষপতি— রম্ভাবতীর নিষেধ অমান্য করেন– কারণ এটাই ছিল সামাজিক নিয়ম, নারীকে পুরুষের সমস্ত সিদ্ধান্তেই সহযোগিতা করতে হবে। তাই রম্ভাবতীকেও সহযোগিতা করতে হয়েছিল। সামাজিক রীতি মেনেই ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহ হয়, মনে কোন ধরনের দ্বিধা না রেখেই রম্ভাবতী বরকে বরণ

করে নেন—

"প্রেম লোচন জলে সাধু হইল অন্ধ

কোলে করি জামাতার শিরে দিল গন্ধ।

বসাইল জামাতার লোহিত কম্বলে

কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে।

অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ চন্দন

দিআ লক্ষপতি করে বরের বরণ।"[৬৪]

আসলে স্বামীর সিদ্ধান্তের কাছে নারীর কণ্ঠস্বরকে কোনো মান্যতাই দেওয়া হত না। স্বামীর কৃপা ছাড়া কল্যাণ নেই, লহনা এরকমই কথা উচ্চারণ করেছে –

"হাস পরিহাস করে বসিআ দম্পতী

জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু ধনপতি।

লহনা বলেন নাথ তুমি পুণ্যবান্

তোমার কৃপায় মোর ঘরের কল্যাণ।"[৬৫]

এই কৃপা যেন বজায় থাকে তাই খুল্লনা পতির আদেশে রান্না করে, কারণ নারীর অন্তর্জীবনে গৃহকর্মই তার প্রধান ধর্ম—

"পতির আদেশ ধরি রান্ধেন খুল্লনা নারী

স্মঙরিআ সর্বমঙ্গল।"[৬৬]

মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করেই অনেকগুলি ব্যঞ্জন সে রান্না করে ফেলে। সবাই খুব প্রশংসা করে, এবং তাতেই লহনার ঈর্ষা আরও বেড়ে যায়। এতে লহনা উচ্চস্বরে গালি দেয়—

"ভোজন করিতে দুয়া ডাকে লহনারে

গঞ্জিআ লহনা কিছু বলে উচ্চস্বরে।"[৬৭]

দুই সতীনের মধ্যে কলহ চূড়ান্ত রূপ নেয়; সংসারে প্রচণ্ড পরিমাণে অশান্তির সৃষ্টি হয়—

"*লহনাকে তাই প্রচণ্ড কলহ এবং হাতে পায়ে মারামারির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ঝগড়া ও মারামারিতে যে খুল্লনাও কম নয়, কবি কাব্য মধ্যে তার পরিচয় দিয়েছে। লহনার সঙ্গে আসলে পাল্লা দিয়ে সে কলহ করেছে এবং অনেকক্ষণ লড়াই করেছে। শেষপর্যন্ত গায়ের জোরে সে হেরেছে।*"[৬৮] সতীন সমস্যা এত বিকৃত রূপ হাতাহাতিতে পর্যবসিত হয়, শুধু অধিকারের লড়াই, অধিকার ছিল স্বামীর সঙ্গে থাকার অধিকার, স্বামীকে পাবার অধিকার—

"*তুমি আমি দুহেঁ সাধুর নারী*

সাধু বিনে হয় দুহাঁর গাড়ি।

... ...

কেশাকেশি দুহেঁ অঙ্গনে ফিরে

প্রবোধিতে দুয়া দুহাঁরে নারে।

কন্দল শুনি আল্যে সভে ধায়্যা

উচিত না বল দুচক্ষু খায়া।"[৬৯]

খুল্লনার জীবনে দুঃখ কষ্টের চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। স্বামীকে কেন্দ্র করেই নারীর জীবন গড়ে উঠে; খুল্লনাও তার ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু সেখানে সুখের হাওয়া নেই দুঃখের হাওয়া সর্বদাই প্রবহমান। "*খুল্লনার বারমাস্যায় অভাব ও দারিদ্র্যের চিহ্ন যথেষ্ট আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে সপত্নীর লাঞ্ছনা। সে দরিদ্রের গৃহিণী নয়, সদাগরের কামিনী। লহনার বিকৃত চেহারায় বিতৃষ্ণ হয়েই ধনপতি খুল্লনাকে নিয়ে আসে সংসারে। আর সেই সপত্নী-ঈর্ষার জ্বালাতে লহনা চরম প্রতিশোধ নিতে থাকে খুল্লনার ওপর। যে-অস্ত্রে খুল্লনা জয় করে নিতে চায় স্বামীর মন, লহনার উদ্দেশ্য সে অস্ত্রের ধার নষ্ট করে দেওয়া। বনে ছাগল চরাতে বাধ্য করে, অনাহারে রেখে, চুলে তেল না দিয়ে, ছেঁড়াকাপড় পরিয়ে লহনা চেয়েছিল খুল্লনার যৌবনের লালিত্য নষ্ট করে দিতে। খুল্লনার বারমাস্যায় তাই বারবার ফিরে আসে লহনার নির্যাতনের*

প্রসঙ্গ মিথ্যাপত্র দেখিয়ে লহনা তাকে ছাগল চরাতে বললে খুল্লনা মিনতি জানিয়েছিল, কিন্তু তার উত্তরে শুধু জুটেছিল কিল আর লাথি। আষাঢ়ের ঘন বর্ষায়, শ্রাবণের প্রবল বন্যায় ছাগল চরানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আশ্বিনে আশ্বাস জাগে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের কিন্তু বাস্তব অতি নিষ্ঠুর। কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষে শীতের দুরন্ত দাপট। একটি খুঞা আর পুরনো খোসলা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই খুল্লনার। মাঘ মাসে আর এক নতুন বিপত্তির সামনে পড়লো সে। কুয়াশার আড়ালে শেয়ালে খেয়ে ফেলল একটি ছাগল। ... ফাধনে তাকে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে হয়, আর চৈত্রে সহ্য করতে হয় অনাহারের জ্বালা। ... খুল্লনা জানতো লহনা সুযোগ পেয়ে তার উপর অত্যাচার চালাচ্ছে– এ দুঃখের অবসান একদিন হবে, যখন ফিরে আসবেন স্বামী ধনপতি।"[৭০] দুঃখ চিরকালই একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না– 'দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান'– একদিন ঘটবেই। তাই খুল্লনা সেই দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছিল।

স্বামীর বিরহ যন্ত্রণায় খুল্লনা কাতর হয়ে উঠেছে। "*স্বামীর অধিকারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের দেবসমাজ, ব্যাধ ও বণিক সমাজে যতগুলি কোন্দল রয়েছে লহনা ও খুল্লনার সপত্নী দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যে প্রধান। ... কবি মুকুন্দ লহনা ও খুল্লনার বিবাদে দেখাতে চেয়েছেন, একজনের দেহ ও মনের আনন্দ ও সুস্থতা নষ্ট করেই অপরের যত কিছু আনন্দ। অর্থাৎ একজনকে পিষ্ট করে তবে তার পাশে অন্যের দাঁড়ানোর সুযোগ লাভের প্রচেষ্টা দেখান হয়েছে।"*[৭১]

লহনা যেভাবে খুল্লনার প্রতি ব্যবহার করেছিল, তাতে স্বামীকে হারাবার ভয়ই হয়তো তার মনে কাজ করেছে। আসলে "*ভারতবর্ষের গার্হস্থ্য ধর্মে পত্নীর পতিনিষ্ঠা যুগ যুগ ধরে চর্চিত ও প্রশংসিত। শাস্ত্র বিনা প্রশ্নে হিন্দু নারীর কাছে দাবি করেছে স্বামীর প্রতি একাগ্রতা ও নৈষ্ঠিক ভক্তি।"*[৭২] নারীমন এভাবেই আমাদের কাছে কল্পিত। তবে শাস্ত্র সম্মত নারী না হলেই বিপত্তি।

লহনা নিঃসন্তান ছিল, বন্ধ্যানারী তাই ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করেন। তখনকার সমাজে বন্ধ্যা নারীর জীবন কোনো নারীরই কাম্য ছিল না, খুল্লনা সুন্দরী নবযৌবনা প্রাপ্ত, তার কাছে সন্তানের কামনা করেই ধনপতি তাকে বধূ হিসেবে গৃহে এনেছিলেন। তাই খুল্লনার মধ্যে সেই নারীত্বের অহংকার প্রতিনিয়ত কাজ করেছে। দেবীর বরে খুল্লনা গর্ভবতী হয়—

"মর্তে আইল কুমার দেবীর আরতি

মধুমাসে খুল্লনা হইল গর্ভবতী।"[৭৩]

গর্ভের সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মায়ের যে কষ্ট আর্তি যন্ত্রণা সেই অন্তর্জীবনের ভাব খুব সুন্দরভাবেই উঠে এসেছে কবি মুকুন্দের কলমের স্পর্শে—

"প্রভাতে উঠিআ বলে খুল্লনা সুন্দরী

বেদনায় জ্ঞানহত হৈল বুঝি মরি।

হেনকালে লহনা কহিল দুবলারে

পার্শ্বিকে ডাকিআ আন চলহ নগরে।

সুতিকা ভবনে তথা আসি নারায়ণী

খুল্লনারে আসীষ দিলেন শিরে পাণি।"[৭৪]

পুত্র শ্রীপতির মাতারূপে খুল্লনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে কবি মুকুন্দ তার চরিত্রে মাতৃত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন নারী পরিপূর্ণ হয় মাতৃত্বগুণেই। সেই পুত্রকে কেন্দ্র করেই এখন খুল্লনার সুখ-দুঃখ সব কিছু। শ্রীপতি চণ্ডীর বরপুত্র ; কিন্তু পিতা ধনপতি *"হঠাৎই খুল্লনার আরাধ্যা চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করেছে দেবী চণ্ডীর সঙ্গে তার কোন বিরোধ ছিল না, বিরোধের কোন কারণও ছিল না, এবং এর ফলে সমুদ্র পথে কমলে কামিনীর ভ্রান্তি দর্শন করেছে। সিংহলে গিয়ে তার যে ভাগ্য বিপর্যয়. তা ঘটল দেবীর কোপে।"*[৭৫] এই সিংহলে শ্রীপতি পিতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, তার জন্য মা খুল্লনার অনুমতিও নিয়েছে, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীপতি পিতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, এবং সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়—

"অভয়ার প্রতিফলে করে কুশে গঙ্গাজলে

রাজা করে কন্যা সম্প্রদান

শয্যা ঝারি ধেনু থালা রথ গজ ঘোড়াদোলা

দিআ জামাতার কৈলমান।

বাজে মঙ্গল-পড়া দ্বিজ বান্ধে গ্রন্তচূড়া

বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী

বন্দিআ রোহিনী সোম লাজ-হুনি কৈল থোম

দুঁহে কৈল অনলে প্রণতি।

দাম্পত্য প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে

কুসুম শয়নে গেল রাতি।"[৭৬]

দাম্পত্য জীবনে সুশীলা প্রবেশ করেছে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দুঃখ তার জীবনকে গ্রাস করে নেয়। সেই দুঃখ সতীন সমস্যার দুঃখ। সুশীলার মধ্যে কোন আকর্ষণই যেন শ্রীপতি খুঁজে পায় না—

"না লাগিল সুশীলার মোহন-প্রবন্ধ

স্বামীর গমনে তার মনে লাগে ধন্দ।"[৭৭]

আসলে বহুবিবাহের যে প্রথা ছিল তাই দাম্পত্য সম্পর্কের পরতে পরতে আঘাত করেছে। রাজকন্যা পত্নী সুশীলাকে নিয়ে শ্রীপতি এবং শ্রীপতির পিতা ধনপতি দেশে ফিরলেন। ধনপতির ডুবে যাওয়া ছয় ডিঙাও উদ্ধার হয়। দেশে ফিরেও শ্রীপতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। উজানির রাজা বিক্রমকেশরী আবদার করলেন শ্রীপতির কাছে যে এই দেশের মাটিতে কমলে কামিনীর দৃশ্য দেখাতে হবে। শ্রীপতির অনুরোধে দেবী তাঁর কমলে-কামিনী রূপ সকলকে দেখান। তাতেই মুগ্ধ হয়ে রাজা তার কন্যা জয়াবতীকে শ্রীপতির হাতে সমর্পণ করেন,

"নৃপতি পুণ্যবান জয়াবতী দিতে দান

করিল শুভক্ষণ বেলা

... ...

নৃপতির অভিলাষ কন্যার অধিবাস

করেন বেদের বিধানে"[৭৮]

সেই বিবাহ থেকেই সুশীলার জীবনে সতীন সমস্যার শুরু। সে স্বামীকে এই বিবাহের জন্য অভিমান করে অনেক কথা বলেছে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসে। এতই সে মর্মাহত হয়েছে যে—

"কান্দে সিলা রাজার নন্দিনী

আকুল কুন্তল ভার না জানে পড়িল হার

স্বামীরে গঞ্জিআ বলে বাণী।

জন্ম হইল সুখস্থলে ছিনু মা-বাপের কোলে

নাহী জানি দুখের বারতা

প্রথম বয়সে দুখ ধরণ না জায় বুক

কোন দোষে দিলে মোরে সতা।

ভাই বন্ধুমাতা পিতা জেবা মোর আছে যথা

সব ছাড়ি গোড়াইলাঙ তোমারে

আমি জত কৈল ক্ষেম তুমি দূর কৈলে প্রেম

দুই কুল নহীল সিলারে।

... ...

চিরকাল থাক জিআ আর কর সাতবিভা

সিলা মাগে সিংহলে বিদায়

বলিপ্রভু শুন কাম অতরে নহীবে বাম

সাজন করিআ দেহ নায়।

সিলা ভাসে শোকানলে শ্রীমন্ত করুণে বলে

না বলিহ আর মিথাভাষী

রাজা করে কন্যাদান আমি কি সাধিব মান

সতা নহে জয়া তব দাসী।"[৭৯]

স্বামীর নিকট থেকে যখন নারী মনে আঘাত লাগে তখন সে আঘাত কম করার জন্য বাবার বাড়িতে যেতে আগ্রহী হয়। স্বামী সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য সুশীলার আঘাত লেগেছে। "*ক্রোধে অন্ধ হয়ে অপমানিতা সুশীলা স্বামীসুখ পরিত্যাগ করে চলে যেতে চায় পিতৃগৃহে। ... স্বামীর দুরাচারিতার বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে আত্মসম্মান বজায় রাখতে চেয়েছে।*"[৮০] তবে নারীদের আত্মসম্মান তাদের বিবাহের পরে তাদের শ্বশুরবাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে; কিন্তু আমরা দেখেছি সুশীলার স্বামী শ্রীপতি যখন মা খুল্লনার কাছে আসতে চেয়েছে, তখন সে তাকে নিষেধ করার জন্য বারমাস্যার কথা বলে। তবে এই বারমাস্যায় কোনও দুঃখই নেই, আসলে সে শুধু স্বামীকে কেন্দ্র করেই বাঁচতে চেয়েছিল, সুশীলা যেন সমাজের তৈরি নারী হয়ে উঠতে পারেনি। নারী যেমন ঘরকন্যার কাজ করে শ্বশুর-শাশুড়ি সকলকে নিয়ে বাস করে, সুশীলা তাদের মত নয়; আর এরকম নয় বলেই "*সিংহলে শ্রীমন্ত দীর্ঘদিন থাকার পর উজানিতে মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাইলে সুশীলা তাকে ... কথা বলে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছে, সেটাই তার বারমাস্যা। তার সুখ বা দুঃখের কথা নয়, শ্রীমন্তের ভবিষ্যৎ সুখাস্বাদই এর প্রধান অবলম্বন। বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে চন্দন, তৈল ও সুশীতল জল, জ্যৈষ্ঠে শ্বেতচামরের বাতাস, আষাঢ়ে শালিধানে ভাত, ক্ষীর, মধু, শ্রাবণে রবির কিরণ, ভাদ্রে 'ডাঁসমশা নিবারণে পাটের মসারী', আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, কার্তিকে শীতবস্ত্র ও শয্যোপকরণ, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে মৎস্য-মাংস, মাঘে পুরাণ পাঠ, মিষ্টান্ন, ফাধনে ফাগুদোল ও চৈত্রে আত্মদানে স্বামীকে তুষ্ট করতে চায় সুশীলা। উদ্দেশ্য একটাই; পিতৃগৃহে থেকে স্বামী সুখভোগ। আনন্দ ছাড়া কোন দুঃখের সাক্ষাৎ মেলে না এ বারমাস্যায়।*"[৮১]

ঋতুর প্রতিকূলতাকে জয় করার নানাবিধ কৌশল ও পন্থা ধনী সমাজের লোকেরা সেকালে যে গ্রহণ করত তা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। তবে সুশীলার কথায় স্বামী শ্রীপতির উপরে কোন

প্রভাব পড়েনি। সুশীলাকে মায়ের চরণে থেকেই সমস্ত কিছু উপভোগ করতে হবে– তাও বলে দেয় তার স্বামী শ্রীপতি। সুশীলার সঙ্গে স্বামীর দাম্পত্য সম্পর্ক যেন ভালোভাবে গড়ে উঠেনি, তার উপরে সতীন সমস্যা। আসলে মায়ের প্রতি শ্রীপতির শ্রদ্ধা ছিল পরিপূর্ণ। পুত্র শ্রীপতিকে কেন্দ্র করে মা খুল্লনারও জীবনের সমস্ত কিছু গড়ে উঠে। "*... শ্রীমন্তের প্রতি বাৎসল্যে সে বাঙালি নারীর পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়েই আত্মস্থ।*"[৮২] এই মর্যাদা পাবার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

আসলে "*নারী কন্যা হিসেবে পিতার অধীন, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর এবং বুড়ো বয়েসে ছেলের।*"[৮৩] তাই খুল্লনাকেও দেখা যায়, কন্যা হিসাবে পিতা লক্ষপতির অধীন, স্ত্রী হিসাবে স্বামী ধনপতির এবং বুড়ো বয়সে পুত্র শ্রীপতির অধীনে থাকতে হয়েছে। পিতা-পতি-পুত্র এই তিন পুরুষের আশ্রিত বৃত্তে নারী তার জীবনে অগ্রসর হয়ে চলে। খুল্লনা তার জীবনে যেভাবে এগিয়ে গেছেন তা একেবারেই সতী স্ত্রীর মত; এই কথা জানতে পেরে স্বামী শ্রীপতিকে কেন্দ্র করে যে কামনা- বাসনা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল সুশীলার মনে তা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে বোধ হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মূল বস্তু পার্থিব জগতের স্পর্শেই গড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের ঘর সংসারের কথা, দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-না পাওয়ার কথা—তা অনায়াসে এখানে আশ্রয় লাভ করেছে। দেবী চণ্ডী আখেটিক খণ্ডে ব্যাধ দেবী চণ্ডী, বণিক খণ্ডে মঙ্গলচণ্ডী রূপে পূজিতা। চাওয়া না পাওয়ার যে ব্যথা-বেদনা তা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য-এর কাহিনিতে। দেবী চণ্ডী "*সমস্ত বাঞ্ছিত বিপদ ও অকল্যাণকে দূর করে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মধ্যযুগের বিস্তৃত বিচলিত সমাজ পরিবেশ সমস্ত ধ্বংস-প্রবণ না-ধর্মী প্রভাবের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং সেই পরিবেশে নিজের অকুতোভয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ এই সীমাহীন শক্তির কামনা করেছে এবং এই কামনাই বাস্তব মূর্তি লাভ করেছে। আর সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে আমরা লৌকিক জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি।*"[৮৪]

জীবনের স্পন্দন এতই গভীরভাবে অনুভব করা যায় যে কবি মুকুন্দ তার প্রতিটি অনুভবের

মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের পাশাপাশি অন্তর্জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি অন্তর্বয়ন, দাম্পত্য জীবনের বোঝা-পড়া, পারিবারিক জীবন, গার্হস্থ্য জীবন – দুঃখ-বেদনা-হাসি-কান্না-আশা-নৈরাশ্য-হতাশা, যার সমন্বয়ে এক একটি জীবন গড়ে উঠে, এরকম জীবনেরই অন্তরে অন্তরে কোথাও বিকশিত হয়, আবার কোথাও অন্তরে অন্তরে দুর্বিষহ – এমন সব জীবনের কথাই মুকুন্দের কলমে স্থান পেয়েছে। সত্যিকার অর্থেই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য সেকালের প্রতিটি ঘরের অন্তর্জীবনের সঙ্গে যেন আমাদের পরিচয় খুব সুন্দরভাবে করিয়ে দেয় – যার মূল্য অপরিসীম।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য নিয়ে আলোচনা করব।

উল্লেখসূত্র ঃ

১। পোদ্দার অরবিন্দ, 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৮

২। সেন সুকুমার (সম্পাদিত), 'চণ্ডীমঙ্গল-কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃঃ ৩

৩। নস্কর সনৎকুমার (সম্পাদনা), 'মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', রত্নাবলী, অগ্রহায়ণ ১৪১৭, পৃঃ ৪১৭

৪। তদেব, পৃঃ ৪১৭

৫। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল-কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ১৮

৬। তদেব, পৃঃ ১০

৭। তদেব, পৃঃ ১১

৮। তদেব, পৃঃ ১২

৯। তদেব, পৃঃ ১৩

১০। প্রাগুক্ত, 'মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', পৃঃ ৪১৮

১১। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ২৫

১২। গঙ্গোপাধ্যায় ড. শম্ভুনাথ, ‘মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব’, পুস্তক বিপণি, বইমেলা ২০০০ সাল, পৃঃ ৫৩

১৩। প্রাগুক্ত, ‘চণ্ডীমঙ্গল – কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত’, পৃঃ ২২

১৪। প্রাগুক্ত, ‘মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’, পৃঃ ২৫

১৫। তদেব, পৃঃ ২৬-২৭

১৬। চৌধুরী শ্রী ভূদেব, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’, (প্রথম পর্যায়), দে’জ পাবলিশিং, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃঃ ১৯৬

১৭। ভট্টাচার্য্য ড. আশুতোষ, ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০০২, পৃঃ ৪৩৩-৪৩৫

১৮। প্রাগুক্ত, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ’, (প্রথম পর্যায়), পৃঃ ১৯৮-১৯৯

১৯। শরীফ আহমদ, ‘ইতিহাস ও সমাজ চিন্তা’, মাওলা ব্রাদার্স, আষাঢ় ১৪০৮, পৃঃ ৭৫

২০। রায় নীহাররঞ্জন, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, (আদিপর্ব), দে’জ পাবলিশিং, মাঘ ১৪১৪, পৃঃ ৭১৪

২১। সুর ড. অতুল, ‘বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন’, সাহিত্যলোক, কার্ত্তিক ১৪১৫, পৃঃ ২২১

২২। প্রাগুক্ত, ‘মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ’, পৃঃ ৭০

২৩। তদেব, পৃঃ ৭১

২৪। প্রাগুক্ত, ‘চণ্ডীমঙ্গল – কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত’, পৃঃ ৬৪-৬৫

২৫। প্রাগুক্ত, ‘মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’, পৃঃ ৩৫

২৬। তদেব, পৃঃ ৩৭

২৭। প্রাগুক্ত, ‘চণ্ডীমঙ্গল – কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত’, পৃঃ ৫৯-৬০

২৮। প্রাগুক্ত, ‘মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’, পৃঃ ৩৫

২৯। গঙ্গোপাধ্যায় ড. শম্ভুনাথ, ‘মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র’, প্রজ্ঞা বিকাশ,

বইমেলা ২০১১ সাল, পৃঃ ৩৫-৩৬

৩০। ভট্টাচার্য তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃঃ ১০৬

৩১। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ৬০

৩২। তদেব, পৃঃ ৪৩

৩৩। তদেব, পৃঃ ৪৬

৩৪। তদেব, পৃঃ ৬২

৩৫। গুপ্ত ক্ষেত্র, 'কবি মুকুন্দরাম', গ্রন্থনিলয়, মাঘ, ১৪১৩, পৃঃ ৭৪

৩৬। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ৫৪

৩৭। তদেব, পৃঃ ৬২

৩৮। প্রাগুক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র', পৃঃ ২৪

৩৯। মুখোপাধ্যায় তরুণ (সম্পাদনা), কবি মুকুন্দরাম বিরচিত শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'কবিকঙ্কণ – চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী', সাহিত্যলোক, আশ্বিন ১৪০৭, পৃঃ ২৯

৪০। মজুমদার ভবেশ, 'মঙ্গলকাব্য কবিকঙ্কণ – চণ্ডী', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, মহালয়া, ২০১০, পৃঃ ৬৪

৪১। প্রাগুক্ত, 'কবিকঙ্কণ – চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী', পৃঃ ২৯

৪২। প্রাগুক্ত, 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', পৃঃ ৬৭

৪৩। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল – কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ৪৯-৫০

৪৪। তদেব, পৃঃ ৫০

৪৫। প্রাগুক্ত, 'কবিকঙ্কণ - চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী', পৃঃ ৩০

৪৬। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ৭২

৪৭। তদেব, পৃঃ ৬৬

৪৮। তদেব, পৃঃ ৬৭

৪৯। তদেব, পৃঃ ৭৬

৫০। প্রাগুক্ত, 'মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', পৃঃ ৪০৯

৫১। প্রাগুক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র', পৃঃ ৭৬

৫২। প্রাগুক্ত, 'মানবধর্ম ও মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগ', পৃঃ ৭৩

৫৩। মল্লিক দীপঙ্কর, 'মধ্যযুগ ফিরে দেখা', পুস্তক বিপণি, মার্চ, ২০১২, পৃঃ ১৯৩

৫৪। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ১১২

৫৫। আচার্য্য দেবেশ কুমার (সম্পাদনা), 'কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল', সাহিত্য সঙ্গী, ২৫শে বৈশাখ, ১৪১৮, পৃঃ ৭৮

৫৬। চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী, নিয়োগী গৌতম (সম্পাদক), 'ভারত ইতিহাসে নারী', কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২০০৯, পৃঃ ৫

৫৭। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ১১৭

৫৮। তদেব, পৃঃ ১২০

৫৯। প্রাগুক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র', পৃঃ ১৭৩

৬০। নস্কর ড. সনৎকুমার, 'প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', রত্নাবলী, মাঘ, ১৪০৮, পৃঃ ৬৫

৬১। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল – কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ১৩১

৬২। তদেব, পৃঃ ১৩১

৬৩। প্রাগুক্ত, 'প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', পৃঃ ৬৬

৬৪। প্রাগুক্ত, 'চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত', পৃঃ ১২৪

৬৫। তদেব, পৃঃ ১৫৭

৬৬। তদেব, পৃঃ ১৬০

৬৭। তদেব, পৃঃ ১৬২

৬৮। প্রাগুক্ত, ‘মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র’, পৃঃ ৩২

৬৯। প্রাগুক্ত, ‘চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত’, পৃঃ ১৩৮

৭০। প্রাগুক্ত, ‘প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, পৃঃ ৬৯

৭১। প্রাগুক্ত, ‘মধ্যযুগ ফিরে দেখা’, পৃঃ ২০১

৭২। প্রাগুক্ত, ‘প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, পৃঃ ৭০

৭৩। প্রাগুক্ত, ‘চণ্ডীমঙ্গল - কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত’, পৃঃ ১৭৭

৭৪। তদেব, পৃঃ ২১৬

৭৫। প্রাগুক্ত, ‘মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র’, পৃঃ ১৭৪

৭৬। প্রাগুক্ত, ‘চণ্ডীমঙ্গল – কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত’, পৃঃ ২৯০

৭৭। তদেব, পৃঃ ২৯৪

৭৮। তদেব, পৃঃ ৩০৩

৭৯। তদেব, পৃঃ ৩০৪-৩০৫

৮০। প্রাগুক্ত, ‘প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি’, পৃঃ ৬৬

৮১। তদেব, পৃঃ ৭০

৮২। গুপ্ত ক্ষেত্র, ‘প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন’, পুস্তক বিপণি, বৈশাখ, ১৪০৮, পৃঃ ১৭৬

৮৩। প্রাগুক্ত, ‘প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব’, পৃঃ ১০৫

৮৪। প্রাগুক্ত, ‘মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ’, পৃঃ ৮০